

ব্রহ্মানন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী।

[বৈধব্য-সাধন।]

ব্রহ্ম-নন্দিনী
সতী জগন্মোহিনী দেবী

"The friend I have chosen is the best and truest on earth and in heaven."—*Sri Keshub.*

"আমরা দু'জনে একজন"—শ্রীকেশব।



শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম,
হাবড়া।

১৯১৪

কুন্তলীন প্রেস,
৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-জননীর কৃপায় ব্রহ্মানন্দ-সহধর্ম্মিণী-ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনী প্রকাশিত হইল। এ মহজ্জীবনী কেন যে এতদিন লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয় নাই জানিনা। ইহা এতই উচ্চ এবং শিক্ষাপ্রদ যে ইহার আলোচনা ও অধ্যয়নে যথার্থই আত্মার পরম কল্যাণ লাভ হয়। ইহার মাহাত্ম্য সম্যকরূপে অভিব্যক্ত করিবার শক্তি আমাদের কিছুই নাই। তবে আমরা একমাত্র মাতৃ-কৃপা ও পবিত্রাত্মার প্রেরণার উপর নির্ভর করিয়া সতী আত্মার অনুগমন সাধনায় যাহা পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি এই পুস্তকে এমন মহৎ জীবনের কথঞ্চিৎ আভাসও প্রকাশিত হইয়া থাকে, আমরা আপনাদিগকে যথেষ্টই কৃতার্থ মনে করিব এবং ধন্য হইব।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই পবিত্র জীবনীর উল্লিখিত বিবরণ সমুদয় অধিকাংশই সতীর পরম মাতৃভক্তি-পরায়ণা দেবকন্যাগণের লেখনী প্রসূত। তাঁহারা বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক সংকলনে নানা প্রকারে সাহায্য না করিলে আমরা কখনই ইহা প্রকাশে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। সুতরাং এ পুস্তকের গৌরব যাহা তাহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

সতীর জেষ্ঠা কন্যা শ্রীমৎ কোচবিহার মহারাজ-মাতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সি, আই, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সমুদয় ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আজ শুভদিনে এই পবিত্র দেব-জীবনী সতী দেবীর পরম প্রিয় "আর্য্যনারী-ভগ্নীদল" করকমলে উৎসর্গ করিতে সক্ষম হইলাম।

এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদ যাহা কিছু আছে তজ্জন্য আমরা পাঠক ও পাঠিকা মহাশয়াদিগের ক্ষমা ভিক্ষা করি। তাহা প্রদর্শিত হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

১৮ পৃষ্ঠায় সতীর সাতটী সহোদরই তাঁর কনিষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা ভুল হইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ একজন এবং ছয়জন কনিষ্ঠ ইহা বলা উচিত ছিল।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট।

ব্রহ্ম-নন্দিনী

সতী জগন্মোহিনী দেবী

"The friend I have chosen is the best and truest on earth and in heaven."—Keshub.

"আমরা দুজনে একজন।"—শ্রীকেশব।



সূচনা।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিজ প্রার্থনায় বলিয়াছেন :—

"মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের অপরাহ্ণে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অনেক দিন হইল দুইজনে ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইব

জানিতাম না, নৌকাখানা জলে ভাসাইয়া দিল, সেই তরী ভাসিতে ভাসিতে এখন নববিধানের যুগল সাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

"সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালীর ঘাটে। আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। মা, এত শীঘ্র যে এ আশা পূর্ণ করিবে জানিতাম না।

"প্রার্থনায় কি না হইতে পারে? এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা: একদিকে আমি, আর উনি অন্য দিকে চলেন। কিন্তু এখন কি সয়তান বাধা দিতে পারিল? সয়তান যে বলেছিল, দুজনকে দুইপথে রাখিবে, পরস্পরের দেখা হইবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক বিঘ্ন ঘটিবে; স্ত্রী পরিবার লইয়া যে বিশ্রাম করিবি তা পারিবি না।

"শয়তান দূর হ, তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? মা, তুমি দেখালে হরিনামে কি হইতে পারে।

"আমরা দুজন এখন থেকে মা ভগবতী তোমারই। আমার সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন।

"সকলে এখন দেখিল, বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল, এক আসনে বসিল, এক হরিনাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহা হইল, তখন গেল শোক, গেল নিরাশা, গেল দুঃখ।

"নববিবাহে যে পতি পত্নীর মিলন হয়, এটা কেহ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, এটা হয়। একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষ এক হইল। একজন আমার কাছে বসিল, সে ইহকাল পরকালের জন্য আমার হইল। অমরাত্মা দুইটীর যোগ হইল।

"আমার স্ত্রী আর মেয়েমানুষ নয়, আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। আমরা দুজনে একজন হইলাম, তোমার হইলাম।

"এখন বামে বামা, অন্তরের অন্তরে ভগবান এই তিন জনে এক হইয়া বৈরাগ্যের শ্মশানে বসিয়া বিশুদ্ধ হইতে চাই।

"প্রাণেশ্বর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার যিনি সঙ্গের সঙ্গী তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর; আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনন্ত কালের জন্য গ্রথিত হইয়া সচ্চিদানন্দের সেবা করি।

"আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য, আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে। আমি যেন মহাদেবের শিষ্য হইয়া পত্নীক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়া চিদাকাশে উত্থিত হই। পরিবার সন্তান, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সমুদয় লইয়া তোমার ভিতর বিলীন হইয়া যাইব।"—(দৈনিক প্রার্থনা। ৪র্থ ভাগ।)

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের এই মহান্ উক্তিতেই আমরা সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবন কাহিনীর সূচনা করিতেছি। এই মহাবাক্য ভিন্ন আর কোন্ কথায় এ জীবন-কাহিনীর সূচনা হইতে পারে? বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ যে "সতী স্ত্রীর শীতল ছায়ায়" আপনার শ্রান্তি দূর করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার জীবন কখনই সামান্য জীবন নয়। বাস্তবিক এ জীবন নূতন বিধানে এক নূতন বেদ। কেন না, মানবকে যে "পরিবর্ত্তিত জীবন" দান করিতে নববিধান অবতীর্ণ, সতী জগন্মোহিনীর জীবন তাহারই প্রধান সাক্ষী বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ কেবল নর নয় কিন্তু অশিক্ষিত, কুসংস্কার-সম্পন্ন, সংসার-সর্ব্বস্ব-হিন্দু পরিবারের নারীজাতিও যে প্রার্থনার বলে এবং ব্রহ্মানন্দের মহজ্জীবনের প্রভাবে স্বাধীনভাবে শিক্ষিত সুগঠিত এবং সাংসারিকভাব-পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ-গত-প্রাণ হইতে পারে, তাহারই আদর্শ

প্রদর্শন করিতে যিনি প্রেরিত, তাঁর জীবন সামান্য কি করিয়া বলিব ?

দেবী জগন্মোহিনীর যে বর্ত্তমান কালের নারী-স্বভাবসুলভ দোষ দুর্ব্বলতা প্রথমে কিছু কিছু একেবারেই ছিল না, একথা আমরা বলিতেছি না ; তবে ইহাও নয় যে তিনি অপর সাধারণ নারীগণের ন্যায় ছিলেন, তাঁহার যথেষ্টই বিশেযত্ব ছিল। তাহা না হইলেই বা ভগবান তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ-সহধর্ম্মিণী করিবেন কেন ?

যাহাহউক সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রীব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম এবং জীবনের যে কি মহান প্রভাব তাহার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ সাক্ষী সতী জগন্মোহিনী দেবী। ভক্তের প্রভাবে তাঁহা হইতে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিও যে তাঁহার সঙ্গে এক-অঙ্গ হইতে পারে এবং তাঁহার সহিত এমনই এক-প্রাণ এক-আত্মা হইবে যে "এক হরিনাম করিতে করিতে শুদ্ধ" ও অন্তে "দুজনে একজন" হইয়া যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে, এবং জগজ্জনও যে ক্রমে এক অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ অঙ্গে গ্রথিত হইয়া সর্ব্বজনে একজন হইবে তাহারই পথ দেখাইবার জন্য সতী জগন্মোহিনীর জন্ম ও তাহাই তিনি উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। যিনি বলেন

"Every inch of this man is real" "এ ব্যক্তির প্রত্যেক ইঞ্চি পরিধি মহাসত্যে পূর্ণ", সেই স্বয়ং ব্রহ্মানন্দই যখন ইহা মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা কি ?

ব্রহ্মানন্দ নববিধানের দুইটী সাক্ষী চাহিয়াছিলেন, একটী পরিবার ও একটী দল। মোহম্মদের খাদিজার ন্যায় সতী জগন্মোহিনী যে স্বামীর পূর্ণ অনুগামিনী হইয়া জীবনে নববিধানের প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। বাস্তবিক কিরূপে ব্রহ্মানন্দের মাকে মা বলিয়া ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম করিতে হয় এবং আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মানন্দ-অঙ্গে এক-অঙ্গ হইতে হয়, একমাত্র তিনিই তো তার পথ দেখাইলেন ; এবং এবিষয়ে ব্রহ্মানন্দও তো একমাত্র তাঁহাকেই স্বীকার করিলেন। তিনি না স্বীকার করিলে আমরা যে তাঁর ইহা আপনারা কেবল মনে করিলে কি হইবে ?

বর্ত্তমান যুগে এক অখণ্ড-মানবত্ব বা মানব-ভ্রাতৃত্বের-অবতার রূপেই ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্ম-প্রেরিত। তাই তিনি সকল মানবকে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ব্রহ্মের পিতৃত্ব বা ব্রহ্মযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবের ভ্রাতৃত্ব বা

মানব-যোগ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই জন্যই বর্ত্তমানে নূতন বিধানের অবতারণা এবং ব্রহ্মানন্দই এই ভ্রাতৃত্ব নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করিয়া পূর্ব্ব বিধানের পূর্ণতা নববিধানে সম্পাদন করিলেন। সুতরাং ব্রহ্মানন্দের অনুগমন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বে আত্মবিলীন করিয়া, বা তাঁহার অঙ্গে প্রতিজনে গ্রথিত হইয়া, পরস্পরে এক-অঙ্গ বা এক-ব্যক্তি হইতে না পারিলে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কি উপায়ে ব্রহ্মানন্দের সহিত এক-অঙ্গ হওয়া যায় সতী জগন্মোহিনী দেবী তাহারই নিদর্শন দেখাইয়াছেন।

আবার মানবের ভ্রাতৃত্বও অপূর্ণ, যদি না নারীর ভগ্নীত্ব তাহার সহিত মিলিত হয়। তাই ব্রহ্মানন্দ যেমন মানব ভ্রাতৃত্বের প্রতিনিধি, দেবী জগন্মোহিনী তেমনি নারীর ভগ্নীত্বেরও প্রতিনিধি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আত্মত্যাগিণী হইয়া স্বামীর ধর্ম্ম-সঙ্গিনী হওয়া, স্বামীর অনুগমনের জন্য সমস্ত নিপীড়ন অক্লেশে সহ্য করা, অপৌত্তলিক, কুসংস্কার-বর্জ্জিত আদর্শ-সমাজ এবং সুখী-পরিবার সংগঠনে স্বামীর সহকারিণী হওয়া যে তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণ ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পরিশেষে, স্বামী স্ত্রী এক না হইলে যে

নববিধান সাধনই হয় না, তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ভগবান এই সতী-জীবন আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

নববিধান গৃহস্থ-বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এ ধর্ম্ম নয়। সুতরাং একা একা এ ধর্ম্ম সাধিত হইতেই পারে না। স্বামী স্ত্রী এক-দেহ এক-মন এক-আত্মা না হইলে এ ধর্ম্মের পূর্ণ সাধন হইবে না। স্বামী যত বড় ধর্ম্মবীর হউন না কেন, যতক্ষণ না তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত আত্মায় আত্মায় যোগ যুক্ত হইবেন, ততক্ষণ তিনি পূর্ণ নববিধানী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবেন না।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে সঙ্গী দ্বারাই লোক চেনা যায়। তেমনি স্ত্রীকে দেখিয়াই স্বামীর ধর্ম্মপ্রভাব কত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আগুণের তেজ কত প্রখর পার্শ্বস্থ তৃণখণ্ড দেখিয়াই কি বুঝা যায় না? বাস্তবিক স্বামী স্ত্রী যেমন এক অন্যের চরিত্রের সাক্ষী এমন আর কে? তাই শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রায়ই বলিতেন "তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে প্রশংসা পত্র লইয়া এস তবে জানিব তুমি কেমন।" "বিশ বৎসরের ধর্ম্মের খেলাতে বুঝিলাম ধর্ম্মসাধন পূর্ণ হয় না যতক্ষণ স্ত্রীপুরুষে এক না হয়।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে একা মোহম্মদ ভিন্ন প্রায় সকলেই স্ত্রী পরিবার ত্যাগ করিয়া বা অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নববিধান প্রবর্ত্তক যোগ-ভক্তি-সংসার-বৈরাগ্যে মিলন করিতেই আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গিনী না হইলে নববিধান যে গৃহস্থের ধর্ম্ম তাহা কখনই প্রমাণিত হইত না। তাই ব্রহ্মানন্দ যদিও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মহাধর্ম্মবীর, সতী জগন্মোহিনীর সহানুগমন না পাইলে, তাঁহার মহত্ত্ব কতদূর প্রতিষ্ঠিত হইত বলিতে পারি না। বরং সতীর সহায়তা বিনা তাঁর নিজ ধর্ম্ম-আদর্শ অনুসারে হয়ত তিনি অপূর্ণই থাকিতেন।

তাই বলি, জগন্মোহিনী দেবীর জীবনী নিতান্ত সামান্য নয়। আমাদের মনে হয় ব্রহ্মানন্দ ও জগন্মোহিনীর যুগল-মিলিত জীবনই নববিধানের আদর্শ জীবন ; এবং উভয়ের যোগেই নববিধানের প্রবর্ত্তনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উভয়ে উভয়ের সহায়তাতেই নববিধানের এমন উচ্চ জীবনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। হইতে পারেন এক জন স্বর্গের, একজন পৃথিবীর, একজন সহকার তরু, একজন মাধবী লতা, কিন্তু উভয়ের মিলনেই নববিধানের শোভা এবং সৌন্দর্য্য। সুতরাং এক অন্যে ছাড়িয়া পূর্ণ

আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইলে ঠিক হইবে কখনই বলিতে পারি না।

অন্ততঃ এই সতী সঙ্গে যে ব্রহ্মানন্দ-জীবনের নারী-ভাগ বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল ইহা বলিতেই হইবে। কেন না ব্রহ্মানন্দই স্বয়ং বলিয়াছেন যুগল সাধনে "আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে।" তাই এই যুগল-মিলিত জীবনই নববিধানের আদর্শরূপে গৃহীত হয়, ইহাই বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি; এবং ব্রহ্মানন্দও নিম্নলিখিত উক্তিতে প্রকারান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন :—"প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া যাঁরা আসিতে চান, তাঁরা যদি আসেন দেখা হইবে। যাঁরা আসিতে চান যেন এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই। যাঁহারা বিপথে গিয়াছেন সেই আত্ম-প্রবঞ্চিত ভাই কটী যদি সময় থাকিতে থাকিতে চেষ্টা করেন, তবে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এই পথে তাঁহারা আসিতে পারিবেন। এই পথে যোড়া যোড়া চলিতেছে। অবিশ্বাস করিও না; যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে স্পর্শ করেছে সে বলিতেছে।"—(দৈঃ প্রার্থনা। ৪র্থ ভাগ।)



সতীর জন্মকালে বঙ্গীয় নারীসমাজের অবস্থা।

সতী জগন্মোহিনী দেবী যে নারীকুল উজ্জ্বল করেন, তাহার সামাজিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, কিছু কিছু আলোচনা না করিলে তাঁহার সহায়তায় ব্রহ্মানন্দ যে নারীজাতির কতদূর উন্নতির পথ খুলিয়া দিলেন, তাহা বুঝা যাইবে না।

অবশ্য প্রাচীনকালে হিন্দু রমণীদিগের অবস্থা যথেষ্টই উন্নত ছিল। তখন তাঁহারা এখনকার ন্যায় গৃহে অবরুদ্ধাও থাকিতেন না বা শিক্ষালাভেও বঞ্চিতা ছিলেন না; তাঁহারা উচ্চ ধর্ম্ম সাধনাতেও সর্ব্বদা স্বামীর সহগামিনী হইতেন। তখন সুশিক্ষিতা এবং স্বামীসেবার উপযুক্ত না হইলে কন্যাদিগের বিবাহই হইত না।

ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত দুএকটী শাস্ত্রীয় বচনই যথেষ্ট। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত আছে:— "কন্যাকেও যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিবে এবং লালন পালন করিবে এবং যতদিন স্বামীকে সম্মান করিতে ও সেবা করিতে না শিখে এবং নীতি বিষয়ে সমুন্নত না হয় ততদিন তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিবেন না।"

মনুও বলেন, "যেখানে স্ত্রীলোক সম্মানিত হন সেখানে দেবতারাও তুষ্ট, কিন্তু যেখানে তিনি অপমানিত সেখানে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম বিফল।"

উচ্চ ধর্ম্মসাধনাতেও নারীগণ কেমন যোগদান করিতেন বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন দ্বারাও বেশ বুঝা যাইবে ;—

"মৈত্রেয়ী আপন স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, এই ধনপূর্ণ পৃথিবীটী যদি আমার হয় তাহা হইলে কি আমি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, না, ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের অবস্থা যেমন হয়, তোমার অবস্থা তেমনি হইবে। ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। ইহাতে মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহাতে অমৃতত্ব লাভের আশা নাই সে ধন লইয়া আমি কি করিব?"

এই সকল বচন দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায় আর্য্য-নারীদিগের অবস্থা কত উন্নত ছিল।

এতদ্ব্যতীত সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর ধর্ম্ম-শিক্ষা; ক্ষণা ও লীলাবতীর বিজ্ঞানশিক্ষা; আভেয়ার, মিরাবাই ও হটি বিদ্যালঙ্কারের ন্যায়দর্শনাদি বিদ্যাবত্তা এবং অহল্যাবাই ও রাণী ভবানীর রাজনৈতিকতত্ত্বশিক্ষা

চিরপ্রসিদ্ধ এবং তৎসমুদয় এদেশীয় নারীকুলের প্রাচীন গৌরব চিরদিনই ঘোষণা করিবে।

কিন্তু কালসহকারে সে গৌরব কোথায় বিলীন হইয়া গেল। মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত বা ভয়ে হিন্দু-দিগের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষা প্রায় একেবারেই লোপ পাইল। বিবাহাদি বিষয়েও প্রাচীন প্রথা পরি-বর্ত্তিত হইল এবং জ্ঞানধর্ম্মের অভাবে যেমন হয়, নানা-প্রকার কুসংস্কার কুপ্রথা এবং কুশিক্ষা আসিয়া সুবর্ণময় হিন্দুগৃহকে একেবারে যেন নানাপ্রকার কুরীতির অন্ধকূপ করিয়া তুলিল।

অবরোধপ্রথা যেমন হিন্দু রমণীদিগকে বাহিরের উন্মুক্ত বায়ু হইতে আবদ্ধ করিল, তেমনি সুশিক্ষার উন্নতির স্রোতকেও বন্ধ করিয়া আবদ্ধ কূপে নিক্ষেপ করিল।

নদীর স্রোত বন্ধ হইলেই যেমন নানাপ্রকার আগাছা জন্মাইয়া সে জলকে দূষিত ও বিবিধ রোগোৎপত্তির কারণ করে, তেমনি হিন্দুগৃহে ধর্ম্মশিক্ষা শাস্ত্রশিক্ষা ইত্যাদি বন্ধ হইয়া কেবল কতকগুলি বারব্রত অনুষ্ঠান ধর্ম্মপ্রাণা নারীদিগকে কুসংস্কারাপন্ন করিল। আসল ধর্ম্ম যতদূর হউক না হউক বারব্রত গঙ্গাস্নান তীর্থগমন

করিলেই সকল ধর্ম্ম হইল এইরূপ সংস্কার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল।

লেখাপড়া শিক্ষা ত প্রায় একেবারেই বন্ধ হইল। ক্রমে এমন সংস্কার পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে নারী হইয়া যে লেখাপড়া শিক্ষা করে সে হয় বিধবা হইবে নয় কুলটা হইবে। কাজে কাজেই লেখাপড়া শিখিতে প্রায় কেহই সাহসী হইত না: যদি কেহ কখনও প্রাচীনা হইলে একটু আধটু রামায়ণ, মহাভারত বা অন্নদামঙ্গল এবং কোন কোন বৈষ্ণব ঘরে তুএকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ শিখিতেন, তাহাও তাঁহাদের স্বামীর জীবদ্দশায় প্রায় পড়িতে শিখিতে অবসর পাইতেন না।

শিক্ষাভাব ও উচ্চনীতিধর্ম্ম-সাধনাভাব বশতঃ নারী-দিগের দিন কেবল গৃহস্থালী, রান্নাবাড়া, ঘরকন্না করাতেই এবং পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করাতেই কাটিত। কখনও ক্বচিৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ উপলক্ষে কুটুম্ব বা অপর বাড়ীর স্ত্রীদিগের সহিত দেখাশুনা হইত: তাহাতেও নিজেদের অবস্থার জাঁকজমক দেখাইতে ও নিজ নিজ বাহাতুরীর গাল-গল্প করিতেই ব্যস্ত হইত।

বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বাসর-ঘর, গর্ভাধান ইত্যাদি বিষয়ে কতই জঘন্য তুর্নীতি ও কুপ্রথাও সমাজে প্রচলিত

হইল। অর্থ সঞ্চয়ের প্রত্যাশায় পুরোহিতগণ সরলমতি নারীদিগকে কতপ্রকার কুনীতি-সম্পন্ন ব্রতাদিতেও লিপ্ত করিতে লাগিল। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের নাচ তামাসা, গোপালে উড়ের "বিদ্যা-সুন্দর" যাত্রা, ভদ্র পরিবারের মহিলা ও পুরুষ এক আসরে দেখিতে শুনিতেও লজ্জাবোধ করিত না। দুশ্চরিত্রাদিগের নাচ গান অন্দরমহলেও নিষেধ নাই; অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই অন্ততঃ যুবক যুবতী যাঁরা তাঁহাদের পরস্পর দেখাশুনা রাত্রি ভিন্ন দিনে বা গুরুজনদিগের সম্মুখে হইবার নিয়মও ছিল না।

প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণ যাঁহারা একটু অর্থশালী বা যাঁহারা দূরদেশে থাকিতেন তাঁহাদিগের চরিত্র দূষিত হওয়া যেন অবশ্যম্ভাবী প্রথার মধ্যে ছিল; তাহা হইলেও স্ত্রীদিগের তাহার উপর কথা বলিবার অধিকার এবং সামর্থ্য অল্পই ছিল। দূরদেশে যাঁহারা চাকরী করিতেন তাঁহারা প্রায় সহ-ধর্ম্মিণী দিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। ক্বচিৎ কোন কোন ব্যক্তিকে যদি বহু দূরে গিয়া প্রায় স্থায়ীরূপে বাস করিতে হইত, তিনিই পরিবারাদি লইয়া বিদেশে যাইতেন; নতুবা একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়মে কোন নারীই স্বামী সঙ্গে যাইতে পারিতেন না। কেবল তীর্থ পর্য্যটন বা দেব দেবী দর্শন ও গঙ্গাস্নানে যাইতে কোন মহিলার নিষেধ ছিল না।

নারীদিগের মধ্যে জামা বা সেমিজ গায়ে দেওয়া তো আদৌ চলনই ছিল না এবং ধনাঢ্য গৃহস্থের বাড়ীতে মহিলারা যেরূপ পাতলা সাড়ী পরিতেন, তাহা পরিয়া পুরুষের সম্মুখে বাহির হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইলেও তাহাতে কাহারও লজ্জাবোধ ছিল না। এইরূপ বহু প্রকারের কুরীতি কুসংস্কার যাহা বর্ত্তমানে কালে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে এবং বিশেষভাবে নারীদিগের সুশিক্ষার গুণে ও সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনে চলিয়া যাইতেছে, তাহা হিন্দু সমাজে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল।

সতী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মগ্রহণের পর ব্রহ্মানন্দ সতীসহ অল্পে অল্পে এই সকল কুপ্রথা নিবারণের অনেক উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তিনিই বর্ত্তমান যুগে প্রধানতঃ প্রথম এই হিন্দু সমাজ সংস্কার বা সমাজ পরিবর্ত্তনের এক নূতন পথ খুলিয়া দেন। সতী জগন্মোহিনী দেবীর সহযোগে হিন্দু নারীগণের স্বভাব অনুরূপ সুশিক্ষা বিধান দ্বারায় ধর্ম্মভাবে সমাজের ক্রমোন্নতি সাধন করিতেই ব্রহ্মানন্দ চেষ্টা করেন।



জন্ম ও শৈশবকাল।

সতী জগন্মোহিনী দেবী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর, রবিবার; সন ১২৫৪ সালের ১২ই পৌষ, প্রাতে ৭টার সময় ভূমিষ্ঠা হন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রমোহন মজুমদার, পিতামহের নাম হরচন্দ্র মজুমদার, মার নাম শ্রীমতী নিত্যকালী দেবী। তাঁর পিতৃভবন, বালী; কিন্তু আগড়পাড়ায় তাঁর মাতুলালয়েই সতীর জন্ম হয়। তাঁর মাতামহ পঞ্চানন সেন, অতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ, নিষ্ঠাবান্, সাধনশীল হিন্দু ছিলেন। তিনি নাকি অতি শুদ্ধাচারী, সচ্চরিত্র ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সতীর মাতামহ ও পিতামহ দানশীলতার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। মাতাও বিশ্বাসিনী ভক্তিমতী নারী ছিলেন। পিতামহ, মাতামহ ও মাতৃদেবীর ধর্ম্মনিষ্ঠা সতীর জীবনে অতি শৈশবকাল হইতেই প্রতিফলিত হয়। দেবী জগন্মোহিনীর বালিকা জীবনও অতি উচ্চ ও সৌন্দর্য্যময় ছিল।

শৈশবে বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ দৈব-নিষ্ঠার আভাসও লক্ষিত হইত। অন্যের কষ্ট তিনি কিছুতেই দেখিতে পারিতেন না। ভাই ভগ্নীদের মধ্যে

কাহাকেও ভূমিতে শুইয়া থাকিতে দেখিলে আপনার গায়ের কাপড় বা শাল যাহা কিছু পাইতেন তাহা পাতিয়া দিয়া না শুয়াইলে যেন তাঁর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। পিতৃ-ভক্তির ও মাতৃভক্তির পরিচয় তিনি অতি শৈশবকাল হইতেই দেখাইয়াছেন। পিতামাতা উভয়েরই যে কোন প্রকারে পারেন সেবা করিতে পারিলে যেন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

দেবী মাতাপিতার সর্ব্বজেষ্ঠা কন্যা। তাঁর কনিষ্ঠ সাতটী ভাই ও দশটী ভগিনী। ইহাঁদের সকলেরই প্রতি শৈশবকাল হইতে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি শৈশব-কালে মাতার গৃহ কর্ম্মের ও শিশুপালনের বিশেষ সহায় ছিলেন। শুনা যায়, মা লক্ষ্মী আসিয়া যদি তাঁর দুঃখিনী মার দুঃখ দূর করেন এই আশায় তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় চৌকাঠে জল দিয়া শাখ বাজাইতেন এবং লক্ষ্মী পূজার দিনে অতি নিষ্ঠার সহিত আলপনা দিয়া পূজাদির আয়োজন করিয়া দিতেন। ইহাদ্বারা যেমন তাঁর মাতৃভক্তি, তেমনই তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠারও পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব হইতেই সতী অতিশয় ধর্ম্মাপরায়ণা ছিলেন।

তিনি শৈশবে কিছু কৃশাঙ্গী ও শ্যামবর্ণা ছিলেন; কিন্তু অতিশয় সুলক্ষণাক্রান্তা ও সুন্দরী বলিয়া তাঁহার

আত্মীয়েরা তাঁহাকে গোলাপসুন্দরী নাম দিয়া ছিলেন, এবং ভবিষ্যতে তিনি কোন রাজরাণী হইবেন বলিয়া আত্মীয়স্বজনগণ সর্ব্বদাই কল্পনা করিতেন। রাজরাণী হওয়াই নারী জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, এই মনে করিয়াই তাঁহারা ইহা অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে রাজরাণী অপেক্ষা অনেক উচ্চপদাভিষিক্ত হইবার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত, কত রাজরাণীর প্রসবিনী হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং ভবিষ্যতে কত রাজরাণীর মুকুটও তাঁর পদতলে অবলুণ্ঠিত হইবে, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যাহাহউক তাঁহার শৈশব লক্ষণেও যে তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আভাস ছিল ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

দেবী শৈশব হইতেই অতিশয় ধীর, শান্ত এবং অতিরিক্ত লজ্জাশীলা ছিলেন। অপর সাধারণ পল্লী-গ্রাম-বাসিনী বালিকাদিগের ন্যায় তিনি ঝগড়াটে, বাচাল বা চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই যেমন লোকে কথায় বলে তাঁর মুখে সাত চড়ে রা ছিল না; অথচ তিনি বড়ই দৃঢ়-নিষ্ঠ স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং যাহা ধরিতেন তাহা বড় একটা ছাড়িতেন না।

অতি শৈশবে নয় বৎসর বয়সেই দেবীর বিবাহ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অতি অল্পই পরিমাণে দেশে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ ইংরাজী ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কুক বা মিসেস্ উইলসন্ নাম্নী এক ধর্ম্ম-পরয়ণা খৃষ্টান মহিলা প্রথম কলিকাতায় স্ত্রী শিক্ষালয় স্থাপন করেন এবং কয়েক বৎসরে ২১৪টী মাত্র বালিকা লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার বেথুন কলেজও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে সতীর শিক্ষা অল্পই হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই পদ্য ছড়া মুখস্থ বা ছড়া রচনা করিবার প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখা যাইত এবং তাঁর সকল কাজ কর্ম্মেই বেশ গিন্নিপনা ছিল। ফলে ভবিষ্যতের সকল লক্ষণই তাঁর শৈশব জীবনে লক্ষিত হইয়াছিল।

এক্ষণে, তাঁর ছোট মাসীমাতা সতী জগন্মোহিনীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই তাঁর এই শৈশব কালের বিবরণ শেষ করিতেছি। তিনি বলেন ঃ—

"আগড়পাড়ার বাড়ীতে গোলাপের জন্ম হয়। আমি তখন ছেলে মানুষ, আমার অনেক ঘটনা অল্প অল্প

মনে হয়। আমি দিদির আঁতুড়ঘরে দিনরাত থাকিতাম; দিদির সঙ্গে ভাত খাইতাম। ছেলের ন্যাকড়া—খিড়কির পানাপুকুরের পানা ঠেলিয়া কাছিয়া আনিতাম, আরও কত কি কাজ করিতাম। তখন কাজ করিতে বড় স্ফূর্ত্তি হইত। আমার মা, খুড়িরা, অন্য ব'নেরা, সকলে আমায় উৎসাহ দিয়া বলিতেন, 'ও তোর মেয়ে, বড় হ'লে তোরে মাসি বলে ডাক্‌বে', আর আমি আহ্লাদে গ'লে যাইতাম। একটু বড় হ'লে আমি কোলে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতাম। অনেক প্রাচীন লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে থাকিতেন। দিব্বি ফুট্‌ফুটে মেয়েটি দেখে সকলেই কোলে লইতেন, আর বলিতেন মেয়েটী সুলক্ষণা ভাগ্যবতী হবে।

"আমার বোধ হয় মতির (সতীর বড় ভাইএর) অত আদর হইত না যত গোলাপের হইত। বাবা, কাকারা সকলে গোলাপকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমার মেজকাকা খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি গোলাপকে 'গুলি' বলে ডাক্‌তেন, যখন তিনি বাহিরে সকালে একখানি পাথরের চৌকিতে বসে মুখ ধুইতেন, গোলাপ গিয়ে তাঁর পিঠের উপর পড়িত। তিনি 'গুলি বুড়ি' 'পাকা বুড়ি' ব'লে আদর করিতেন, তারপর সন্দেশ

পয়সা দিতেন। মেজ কাকার কোনরূপ খেলার বাই ছিল, তিনি খেলিতে যাইবার সময় বলিতেন, "গুলি বুড়ি! আজ জিত্ হলে কাল খুব পয়সা দিব", গোলাপ বলিত "আচ্ছা", তার পর দিন সকালে সত্যই পয়সা সন্দেশ সকলকেই দিতেন।

"একবার বাবা কোন কাজের জন্য ঘাটালে যান; যাবার সময় গোলাপকে বলিলেন, তোমার জন্যে কি আনিব? গোলাপ বলিল 'পচা মাছ এ'ন।' বাবা হাসিয়া চলিয়া গেলেন। শুনিলাম সে কাজে অনেক টাকা পান। সেই অবধি দেখিলেই বলিতেন, 'গোলাপ্! তোমাকে পচা মাছ এনে দেব।' এইরূপে গোলাপকে দেখিয়া গেলে যাত্রা শুভ হইবে প্রায় সকলেই মনে করিতেন।

"গোলাপ বাল্যকাল হইতেই অতিশয় লাজুক, ধীর এবং শান্ত-স্বভাবা ছিল। যদি কেহ তাহাকে কোন কারণ বশতঃ ধম্কাইতেন, তাহা হইলে মেয়ে একেবারে ভয়ে নীলমূর্ত্তি হইয়া যাইত। সেজন্য কেহ তাহাকে কখনও কড়া কথা বলিতেন না। গোলাপ এত শান্ত প্রকৃতির ছিল যে জ্ঞানকৃত এমন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না যাহাতে কাহারও নিকট অপরাধিনী হইতে হইত।

"আমাদের বড় পিসে মহাশয় বড় আমোদ প্রিয় ছিলেন, তিনি গোলাপকে প্রায়ই তামাসা করিতেন। যখন নারকোল শাঁস খেতে খেতে গোলাপকে ডাক্‌তেন, গোলাপ বোল'ত 'আমি ঢেঁকি বরের কাছে যাব না'; পিশে মহাশয় বলিতেন 'এ মেয়ে বড় সুখী হবে।' যখন গোলাপের আট কি নয় বৎসর বয়স, তখন প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিতরূপে মহাদেবের পূজার্চ্চনা করিত। পূজার পূর্ব্বে কদাচ কিছু মুখে করিত না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা বেলায় একখানি কাচা কাপড় যত্ন পূর্ব্বক নিভৃত স্থানে রাখিত, প্রাতে সেই খানি পরিয়া শিব পূজা করিত।

"আমার মা যখন কাপড় কাচিতে যাইতেন, সদরের বাগানে গিয়া গোলাপ বাগানজাত শাক সব্‌জি ডুম্বুর ইত্যাদি সঞ্চয় করিয়া দিদিমাকে দিত।

"বড় পিশে মহাশয়, সেজ কাকা উভয়েই আহারের সময় গোলাপকে লইয়া আহার করিতেন; সকলের সঙ্গে কিছু কিছু না খাইলে তাঁহারা যেন তুষ্ট হইতেন না। পঞ্চানন সেনের যদিও অনেক পুত্র পৌত্র ছিলেন, কিন্তু গোলাপের ন্যায় কাহারও এত আদর ছিল না।

"আমার মা বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাহারও উপবাস করা তাঁহার ভাল লাগিত না, গোলাপের অসুখ হলেও মা চুপি চুপি রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে, পান্তভাত আর কুঁচ চিংড়ি ভাজা খাওয়াইয়া বলিয়া দিতেন 'যাও কারো কাছে বল না, শুয়ে থাক গে।"



বিবাহ।

বালিকা জগন্মোহিনী দেবীর বয়স যখন নয় বৎসর মাত্র তখন তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পিতা বৈদ্যবংশের মধ্যে মহা কুলীন ছিলেন। পিতার অবস্থা অবশ্যই কলিকাতাস্থ সেন বংশের সমকক্ষ ছিল না, এবং গোলাপসুন্দরীও তখন কিছু কৃশাঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী, আকর্ণলম্বিত চক্ষু ও নানা প্রকার সুলক্ষণ দেখিয়া দেওয়ান হরিমোহন সেন আপনি কন্যা পছন্দ করিয়া ভ্রাতষ্পুত্র কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ইং ১৮৫৬ সনে ২৭শে এপ্রেল বালী গ্রামে এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। বিবাহ সেন বংশের অবস্থানুযায়ী অতি সমারোহ সহকারেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিবাহের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে স্বয়ং দেওয়ান হরিমোহন সেন বৃহৎ একখানি বেরুস্ গাড়ীতে বর লইয়া সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ দুইটী ভ্রাতাকে নীত বর সাজাইয়া, অনেক ইংরাজী বাজানা নহবৎ, রস্থনচৌকি, আলোকাদি সহ মহা জাঁক-জমক করিয়া কলুটোলার বাটী হইতে যাত্রা করেন। গঙ্গারধারে পৌঁছিয়া তাঁহারা

একখানি সুন্দর বোটে উঠিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকা বজরা রহিল। তাহাতে অন্যান্য বরযাত্রী, চতুর্দ্দোলা, মহাপায়া, নহবৎ ইত্যাদি সঙ্গে চলিল। তার পরদিন প্রাতঃকালে বালীতে পৌঁছিলেন।

সেই দিন মহা ঘটা করিয়া বিবাহ হইল। বালীগ্রামে নাকি এমন জাঁকাল বিবাহ তাহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। সেই জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতেও দলে দলে লোক এই বিবাহ দেখিতে আসে। বিবাহ-বাসরে বহুসংখ্যক নারী সমবেত হইয়া মহা আমোদ উল্লাস করিল। নৃত্য গীতাদিরও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু বরের যেন ইহাতে কিছুই আমোদ নাই, সকলেই ইহা লক্ষ্য করিল। যাহাহউক বিবাহের পরদিন দেওয়ান হরিমোহন সেন বর কন্যাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

এই বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীমৎ-আচার্য্য-মাতা সারদাদেবী স্বয়ং আমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—"আমার ভাসুর মহাশয় নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে বিবাহ দেন। বিবাহ উপলক্ষে নাচ বাজনা খুব ঘটা হয়। বালীতে বিবাহের পরদিন গোবিন্দ বরাটকে পাঠিয়ে সেখানকার বাব খরচা কাঙ্গালী-বিদায় ইত্যাদিতে অনেক টাকা

খরচ করে বর ক'নেকে আনা হয়। বর ক'নে বাড়ীতে এলে টাকা পয়সা ছড়িয়ে বরণ করে ঘরে তুলে নেওয়া হয়। ক'নেটী কিন্তু বড় ছোট ও কাহিল দেখে আমার একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ভাসুর মহাশয় জান্‌তে পেরে বল্লেন, "বৌমার মুখ দেখ্‌তে বল"। মুখ দেখে আমার সে ভাব গেল। আমি বড়ই সুখী হলাম। কিন্তু বিবাহ ক'রে যেমন অন্য ছেলের মনে স্ফুর্ত্তি হয় কেশবের তাহার বিপরীত দেখা গেল। কোন কিছু বুঝ্‌তে পাল্লাম না। আমার মনে হ'ল বুঝি মেয়েটী ছোট বলে পছন্দ হয়নি। কেশবের তখন বয়স সতের আঠারো, মেয়েটীর বয়স নয় বৎসর।"

সতীর তখনকার এইরূপ কাহিল শরীর সম্বন্ধে তাঁহার কোন আত্মীয়াও বলেন যে "গোলাপের বিবাহের আগেই ভারি ব্যাম হয়, এমন কি সেজন্য তাঁহার মাথার সমস্ত চুল প্রায় উঠিয়া যায় ও যখন ক'নের মাথায় ফুল চিরুণী পরাইতে যায়, যেমন মাত্র খোঁপাতে চিরুণী গুঁজিয়া দেওয়া হ'ল, অমনি ছোট খোঁপাটী খুলিয়া এলাইয়া পড়িল। তাহাতেই কিন্তু রূপের সীমা ছিল না, গোলাপের মুখ ঠিক বাপের মত ছিল। চন্দ্র বাবু অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন।"

যাহাহউক মা সারদা দেবী তখন বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁর ছেলে অন্য ছেলের মত নহেন, যে তাদের মত বিবাহে আত্মহারা হইবেন। মেয়েটীকে তাঁর পছন্দ হয় নাই বলিয়া যে তাঁর এরূপ ভাব তাহাও নয়। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মনে ভয়ানক বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং প্রথম ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। এই জন্যই তাঁর তখনকার মনের ভাব ঐরূপ দেখা গিয়াছিল।

তিনি নিজেই এই সময়কার আত্মজীবনের অবস্থা সম্বন্ধে "জীবনবেদে" বলিয়াছেন ঃ—"সংসারে প্রবেশ করিবার কাল, আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়া দিলেন সুখ-উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু। শোক সন্তাপ বৈরাগ্যে আমার ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্ম জীবনের সঞ্চার হয়। * * তখন এমন হইল যে দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না। কত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয় তৎসমুদায় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম।

"তখন ধর্ম্ম জানিতাম না, জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল "ওরে

তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না।

"সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল। সংসারের রূপকে ভীষণ দেখিতাম। স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ তাহাকে ভয় হইত।

"যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি এই জায়গাইত শ্মশান। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে; 'সংসার বিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?' ঠিক মনের ভিতর এই সকল কথা কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, এ'কে আমি স্ত্রীর অধীন করিব?—সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।

"এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। তখন সংসার কাছে আসিতে পারিল না। আত্মপীড়ন ও ভার্য্যাপীড়ন দ্বারা ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইল। অবশেষে যাহারা ভয়ের কারণ ছিল তাহারাই বন্ধু হইল।"

বাস্তবিক গৃহস্থ-বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে ভগবান যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন অপর সাধারণ লোকের ন্যায় হইবে কেন? তাই সংসার আরম্ভ কালেই ভগবান তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং মহাবৈরাগ্যরূপ অটলভিত্তিভূমিতে জীবন অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে পরিণামে ফলফুল-সমন্বিত সুন্দর উদ্যানের শোভায় সুশোভিত করিলেন ও জগতের আদর্শ করিয়া তুলিলেন।

একদিকে যেমন কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্যে সংসার আরম্ভ হইল, অপরদিকে জগন্মোহিনী দেবীরও বিবাহিত জীবন নিতান্ত সুখে আরম্ভ হয় নাই। বিবাহের পর যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে জামাতার গৃহ হইতে নিজ আলয়ে লইয়া যান সেই সময়ে তাঁহাকে যে নৌকা করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকাখানি জল-মগ্ন হইয়া যায়। নবমবর্ষীয়া বালিকা নৌকাডুবি হইয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিবেন, এমন সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার পিতাও তাঁহাকে রক্ষা করা দূরে থাক তিনিও জলমগ্ন হন; কিন্তু ভগবান যাঁর জীবনে পরে কত লীলাই করিবেন, তাঁকে এমনি হঠাৎ জলমগ্ন হইতেই বা দিবেন কেন? তিনিই নিজে এই বিপদ সঙ্কটে মৃত্যুমুখ হইতে

বালিকার প্রাণরক্ষা করিলেন। দৈবক্রমে তৎক্ষণাৎ আর একখানি নৌকা তীর হইতে আসিয়া জলমগ্ন অবস্থা হইতে নববিবাহিতা বালিকা ও তাঁর পিতাকে তুলিয়া তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইল। এই ঘটনা দ্বারাও ভগবান দেখাইলেন যে সতীর জীবন কেবল সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইবে না, কিন্তু অনেক বিপদ পরীক্ষার ঝড় তুফানও তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে।



বিবাহের পরবর্ত্তী কাল।

সতী-জীবন চিরকালই পরীক্ষা সংকুল। বিধাতা যাঁহাকে সতীত্বের গৌরব মুকুট দান করিতে মনস্থ করেন, তাঁহাকে চিরদিনই পরীক্ষার আগুণে দগ্ধ করেন। সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী কেহই এই দুঃখ পরীক্ষার বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। সীতা যেমন আজীবন পরীক্ষার পর পরীক্ষা বহন করিয়াছিলেন, সতী জগন্মোহিনী দেবীকেও প্রায় তাহাই করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগের আদর্শ-বৈরাগী স্বামীর সহিত বিবাহ হইতেই তাঁহার জীবনের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। "অরণ্যবাস এবং বৈরাগ্যে" যেমন ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়, সতী জগন্মোহিনীরও বিবাহিত জীবন তাহা ভিন্ন অন্যরূপ আর কি প্রকারে হইবে?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মানন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "ভার্য্যাপীড়নেই" তাঁহার জীবন আরম্ভ। নয় বৎসরের বালিকা তাঁর এ বৈরাগ্যের তত্ত্ব আর কি বুঝিবেন? কিন্তু বিধাতা যাঁর সঙ্গে তাঁহার জীবন গ্রন্থি বাঁধিয়া দিলেন, তিনিত আর সাধারণ মানুষ নন; কাজেই তাঁহার

জীবনের মহা ধর্ম্মভাবের যত কিছু ধাক্কা যে সতীকে লাগিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

পৃথিবীতে সচরাচর লোকে বিবাহ করিয়া বিষয় সুখে মগ্ন হয় ; যদি কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী হন, তাঁহারা কিছু দিন সংসার করিয়া পরে সংসারে হয়ত বীতরাগী হন। কিন্তু যাঁহারা সংসারেই বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রেরিত তাঁহাদের জীবন অপর সাধারণ লোকের ন্যায় হইবে কেন ? কাজেই মহা বৈরাগ্যের ভিত্তিতেই তাঁহাদের সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল। শ্মশানভূমিতেই তাঁহাদের বাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। কালো ক্ষেত্রের উপরেই তাঁহাদের জীবন ছবি অঙ্কিত হইল।

বিবাহের পর সতী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন ; এদিকে স্বামীও সংসার-বৈরাগ্য সাধনের যত কিছু সুযোগ হইতে পারে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন।

গুরুজন আত্মীয়গণ তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া কত কি তাঁহার সম্বন্ধে জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ যেমন ভাবিলেন স্ত্রীকে অপছন্দ বলিয়াই তাঁহার এরূপ ভাব হইয়াছে। আবার কেহ ভাবিলেন তিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। কেহ ভাবিলেন তিনি

খ্রীষ্টান হইয়া যাইবেন। এইরূপ নানা প্রকার সন্দেহ, নানা প্রকার আলোচনা করিয়া যাহাতে সংসারে তাঁহার মন বসে এ জন্য তাঁহার নবপরিণিতা পত্নীকে শীঘ্র পিত্রালয় হইতে আনাইলেন। কিন্তু তাহাতে কেশবের বৈরাগ্যানল নির্ব্বাণ না হইয়া আরো প্রজ্বলিতই হইল। তিনি স্ত্রীর মুখ দর্শন বা তাঁহার সহিত প্রায় বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না।

এরূপ শুনা যায় যে বিবাহের পর প্রায় চারি পাঁচ বৎসর কাল এইরূপে ব্রহ্মানন্দ স্ত্রীর সহিত প্রায় কোন সম্পর্কই রাখেন নাই। ইহা অবশ্যই তিনি তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের বৈরাগ্যের উত্তেজনায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের জীবন কিনা প্রত্যক্ষ ভগবানের স্বহস্ত গঠিত, তাই এ ঘটনাতে বিধাতারই আশ্চর্য্য কৌশল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। স্বভাবতঃ উচ্চ নীতিপরায়ণ কেশব-চন্দ্র ঘটনা চক্রে বাল্যবিবাহ করিলেও পাছে তাঁহাকে বাল্যবিবাহের পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এই জন্যই যেন ভগবানই তাঁর প্রাণে এই মহা বৈরাগ্যানল উদ্দীপন করিয়া তাঁহাকে সে অপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন।

তাঁহাদের একান্নভুক্ত বড় সংসার। এখানে সতীর যা, ননদ ইত্যাদি বয়স্কা আত্মীয়া অনেকেই ছিলেন।

সকলেই সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন। এক সঙ্গে সকলে আহার বিহার করিতেন। নিজ নিজ স্বামীর নিকট হইতে প্রায় সকলেই নানারূপ সুন্দর সুন্দর উপহার পাইতেন। কেবল দেবী জগন্মোহিনী পতির নিকট কোন উপহার পাইতেন না, এমন কি তাঁহার দেখাও পাইতেন না। ইহাতে আত্মীয়া মহিলারা সর্ব্বদাই বিদ্রুপ করিতেন ও বলিতেন যে পত্নীকে তাঁর পছন্দ হয় নাই বলিয়াই দেবীকে কখন দেখিতে পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে আসেন নাই, এবং কোন উপহারাদিও দেন নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মহান বৈরাগ্য ব্রতই যে তাঁহাকে ভার্য্যার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছিল অন্তঃপুরের মহিলাগণ তাহা কি বুঝিবেন? এদিকে কিন্তু দেবীর বিবাহিত জীবনের আরম্ভ এত সাংসারিক সুখ বর্জ্জিত হইলেও, তাঁহার হৃদয়ের যাতনা কখনও মুখে প্রকাশ পায় নাই।

"স্বামী ভালবাসেন না," দেবীর কাছে এ কথা নানা ভাবে আসিত। একদিন এজন্য তিনি মনের কষ্টে একটী ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন আত্মীয়া সেই ঘরে কি দ্রব্যের জন্য প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন, দেবী জগন্মোহিনী সেই ঘরে। তখন

সেই আত্মীয়া রাগান্বিত হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "এত বড় স্পর্দ্ধা, আবার একটা ঘর চাই!" দেবী সেই ক্রোধ স্বরে ভয় পাইয়া আপন চক্ষু-জল মুছিতে মুছিতে ত্রস্ত ভাবে দরজা খুলিয়া দিলেন।

তাঁহার প্রতি পরিবারস্থ মহিলাদিগের কিরূপ ভাব ছিল একটী আখ্যায়িকা বলিলেই বুঝা যাইবে। একবার সতীর জ্বর বিকার হয়, এমন কি সে সময় তাঁহার কিছু মাত্র সংজ্ঞাও ছিল না। সেই সময় পরিবারস্থ অপর একটী মহিলারও পীড়া হয়। সেই মহিলাকে দেখিবার জন্য বাড়ীর ডাক্তারকে ডাকা হয়। ডাক্তার সেই মহিলাকে দেখিয়া অন্য ঘরে সতীর সংজ্ঞাহীন অবস্থা শুনিয়া দেখিতে চান। অমনি একজন বলিয়া উঠিলেন "ফুলের সোহাগেই কলার ছোটার আদর," অর্থাৎ ফুলের মালা বাঁধিতেই কলার ছোটার দরকার, কিন্তু যদি ফুলের মালা বাঁধার আবশ্যক না হয়, তবে কলার ছোটার আর আবশ্যকতা কি? স্বামীর জন্য স্ত্রীর আদর, স্বামী যার বিমুখ তার আর আদর কি?

যাহাহউক স্বামীর এরূপ কঠোর ব্যবহার ও অনাদর হেতু সকলকার নিকট এত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইলেও এবং স্বামীর সহিত তাঁহার কোন প্রকার প্রায় বাক্যালাপ

না থাকিলেও সতীর প্রাণে তখন হইতেই স্বামী-ভক্তি এবং স্বামী-প্রণয় দৃঢ় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি তখন উপাসনা প্রার্থনা বা ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই তেমন জানিতেন না, কিন্তু শুনা যায় যে বিবাহের পর হইতেই প্রতি দিন স্নানের পর স্বামী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতেন এবং তাহাই তাঁহার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সাধন হইয়াছিল।

ধন্য সতী, কোথায় স্বামীর এরূপ বাহ্যত কঠোর ব্যবহারে তাঁহার উপর অপর নারী-সুলভ বিরক্তি পোষণ করিবেন, না আপনাকে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বা অনাদৃত বিলক্ষণ জানিয়াও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রীতি প্রদান করিতে কখনই বিরত হইলেন না। এমন কি এজন্য একাকীই বিরলে কাঁদিতেন, কিন্তু কখনও কাহাকেও তাহা জানিতে দিতেন না। "যদিও তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, তথাপি আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব;" পাতিব্রত্য বা পতির আনুগত্য ধর্ম্মের এই নীতি এমন বাল্যকালেও এই ধর্ম্মশিক্ষাবিহীনা বালিকাকে কে শিখাইল? ইহা নিশ্চয়ই লীলা-রসময় ভগবানের শিক্ষা বিধান ভিন্ন আর কি বলিব? স্বয়ং তিনিই যে সতীর ভবিষ্যত মহত্ত্বের অঙ্কুর তখন হইতেই তাঁহার

হৃদয়ে নিহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জগন্মোহিনী দেবীর বিবাহের পরবর্ত্তী কাল সম্বন্ধে তাঁহার ছোট মাসীমাতা যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া এ বিবরণ শেষ করিতেছি :—

"বিবাহের অনেক পরে গোলাপ যখন আগড়পাড়ায় থাকিতেন, কেশব তখন কখনও কখনও যাইতেন। সেই অবধি সেই বালিকাবস্থাতেই গোলাপের পতিভক্তির বিশেষ পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছিল। কেশব স্নানান্তে উপাসনা করিতে কোন নিভৃত স্থানে ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইতেন। বড় বাড়ী কে কোথায় আছে প্রথম প্রথম বড় একটা কেহ জানিতে পারিত না, কিন্তু ক্রমে যখন জানিতে পারা গেল, তখন ইহাও জানা গেল যে গোলাপও সেই সময় ক্ষণকালের জন্য তাড়িতের ন্যায় অদৃশ্য হইতেন। শেষে গোপনে এ সকল জানিয়া কেহ আর তাহাতে বাধা দিতেন না বা কোন কথা বলিতেন না, কারণ পাছে লজ্জা পায়, আরও ভয় পাছে লজ্জাতে কালিমা মূর্ত্তি হইয়া যায়।

"আগড়পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম কামারহাটী। সেই কামারহাটীতে জজ বেল সাহেবের বাগান নামে

একটী মনোহর উদ্যান ও পুষ্প-বাটিকা ছিল, এখনও সে বাগান আছে। ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা মণ্ডিত কুটীর ছিল, কেশব সেই বাগানে সকলের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। সেই নির্জ্জন স্থানে তিনি কখনও কখনও সমবয়স্কদের নিকট হইতে ক্ষণকালের জন্য কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, সঙ্গীরা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেন না। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত এবং দেবভাব পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ তাঁহার হঠাৎ অদৃশ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না। ক্রমে জানা গেল যে তিনি তাহারই মধ্যে অবসর করিয়া কোন নিভৃত কুটীর মধ্যে উপাসনায় মগ্ন হইতেন। তখন আর কারণ জানিবার আবশ্যকও হইত না। এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম এবং যাঁহার নিকট শুনিয়াছি তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন।

"এক কথায় সাধ্বী সতী রমণীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক সে সমস্তই গোলাপের ছিল। এবং কাজে, কথায়, সরলতায়, দয়ায় তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত!"



জীবনের প্রথম ও প্রধান পরীক্ষা।

শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন চরিত পাঠকমাত্রেই জানেন যে তাঁহার বৈরাগ্য ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া মহা ধর্ম্মভাবে পরিণত হইল, উপাসনা আরম্ভ হইল, এবং আপন অন্তঃর্নিহিত ধর্ম্মভাবের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মভাবের মিলন আছে দেখিয়া, তিনি ১৮৫৭ সালে গোপনে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রমে ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিতও পরিচয় হইল। হিন্দু প্রথানুসারে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষা না লইয়া নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা সংস্থাপন হেতু মহর্ষির সহিত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মযোগ আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নানাপ্রকার উন্নতি সাধন কার্য্যেও তিনি নিযুক্ত হইলেন। তখনও সতীর সহিত কিন্তু কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই।

ইং ১৮৫৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মানন্দ মহর্ষির সহিত সিংহল ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি যাইবার সময় বাটীর কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই। সতী সে সময় আগড়পাড়ায় তাঁর মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন, তিনি যখনই স্বামীর সিংহল যাত্রার সংবাদ শুনিলেন—তাঁহার

বালিকা হৃদয়ে স্বামী-প্রেম এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে তখনই মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং মনকষ্টে কয়েকদিনের মধ্যেই অতিশয় সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁর মনে হইয়াছিল স্বামী বুঝি আর সশরীরে ফিরিয়া আসিবেন না, আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। যাহাহউক বহু চিকিৎসায় দেবী এই সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অভিভাবকগণ ভাবিলেন বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাঁর ধর্ম্মভাব ও বৈরাগ্যের কঠোরতা কিছু দমন হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী কাজ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি আরো ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই ব্যাঙ্কের কার্য্য করিতে করিতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপাইয়া ও বক্তৃতা উপদেশাদি দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর ধর্ম্মপ্রভাব ও কার্য্যোদ্যম দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি ক্রমেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের নিগুঢ় পরিচয় পাইয়াই পবিত্রাত্মা প্রেরণায় তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করিলেন, ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ইং ১৮৬২ সালের ১১ই এপ্রেল, বাঙ্গালা ১২৬৯ সনের বা ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনের প্রধানতম পরীক্ষা হয়। ব্রহ্মানন্দ এই অনুষ্ঠানে আপন সহধর্ম্মিণীকে ব্রাহ্ম-সমাজে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি তাঁহার পত্নীকে যে লইয়া যাইবেন একথা অবশ্যই মাতা সারদা দেবীর নিকট পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সেন পরিবারে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন উচ্চ হিন্দু পরিবারের কুলবধূ পিরালী ঠাকুর বাড়ীতে প্রকাশ্য-ভাবে যাইবেন ইহা সেন পরিবারের পক্ষে বড়ই অমর্য্যাদা-সূচক এবং লজ্জাজনক ব্যাপার। যাহাতে ব্রহ্মানন্দ পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন এ জন্য পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আত্মীয়া মহিলারা দেবী জগন্মোহিনীকেও একেবারে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন। এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিন প্রত্যূষেই ব্রহ্মানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমৎ কৃষ্ণ-বিহারী সেনকে দিয়া দেবী জগন্মোহিনীর নিকট দুই একবার চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। দেবীকে আত্মীয়াগণ

বেষ্টন করিয়া আছেন। সকলেই উপদেশ দিতে ব্যস্ত। কেহ কেহ এইরূপ বলিলেন, "তুমি মা, লক্ষ্মী মা, যেও না, তুমি যদি না যাও সব বজায় থাকে, আর কেশবও তাহাতে আবার ফিরে আসিবে, তুমি যেও না।" কেহই ছাড়ে না, তখন বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ আপনিই অন্তঃপুরে গিয়া দেবীকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আত্মীয়ারা বলিলেন "ছি বাবা, বৌকে নিয়ে যেও না" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে কতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

বাটীর সকলেই, এমন কি দাস দাসীগণ পর্য্যন্ত, সতীকে স্বামীর অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কুলের কুলবধু হইয়া স্বামীর সহিত বাড়ীর বাহির হইবেন ইহা অত্যন্ত নির্লজ্জতার পরিচয় বলিয়া কতই তিরস্কার করিলেন। লজ্জাশীলা কুলবধু যিনি কখনও এরূপভাবে বাড়ীর বাহির হন নাই, তাঁহার পক্ষে এত নিষেধ গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়া স্বামীর অনুসরণ করা যেন নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠিল; তাই যেন প্রথমতঃ তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "যদি আমার সঙ্গিনী হইতে চাও এস, এই সময়, নতুবা আমি বিদায় লইতেছি।" মহাসত্য-সঙ্কল্প স্বামীর এরূপ শাসনবাক্য কি সতী আর অন্যথা

করিতে পারেন? দৃঢ়পদে তিনি সকল নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন!

ব্রহ্মানন্দ পত্নীসহ অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া একটী গোল সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। দেবী তখন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা মাত্র। সেই বৃহৎ গৃহের বহির্ভাগে কখনও পদক্ষেপ করেন নাই। বাহিরে যাইতে কেমন যেন ভয়ে লজ্জায় কিছুক্ষণ পা সরিল না। স্বামী ডাকিলেন, আবার কয় পদ নামিলেন, আবার থামিলেন, এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ সেই বালিকা পত্নীকে পুনরায় এইভাবে বলিলেন, "দেখ, তোমার কি ইচ্ছা আমার সঙ্গে এস? একদিকে তোমার এই বৃহৎ গৃহ, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, আর একদিকে কেবল 'আমি'; যদি আমাকে ছাড়, পৃথিবীর আর সমস্তই পাইবে, কেবল আমাকে পাবে না। আর অন্যদিকে কেবল আমি, আর কিছুই নাই। আমার সঙ্গে কি আসিবে?" এই কথা শুনিয়া সতীর হৃদয়ে পতি-প্রেমবল প্রবল বেগে ছুটিল, মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইল, "যাব" এই কথা সবলে বলিয়া পতির পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন। সতী বলিয়াছেন যে এই সময়ে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি

তাঁহার প্রাণে উদ্ভাসিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ কি এক প্রকার স্বর্গীয় বল আসিল যে তিনি পৃথিবীর ধন, মান, জাতি, কুলের দিকে আর তাকাইলেন না; একেবারে বহির্ব্বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ পত্নীসহ বৃহৎ দ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ, দ্বারবানদের খুলিতে বলিলেন, তাহারা অস্বীকৃত হইল, বলিল "বড় বাবুর হুকুম নাই।" ক্ষীণাঙ্গ হইলেও মহাধর্ম্মবল পরাক্রান্ত ব্রহ্মতেজধারী ব্রহ্মানন্দের স্পর্শ মাত্র অলৌকিক বলে যেন দৃঢ় অর্গল খুলিয়া গেল। বাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া তেতলা হইতে দ্বারবানকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন। পূর্ব্ব হইতে দ্বারে পাল্কী প্রস্তুত ছিল, তাহাতেই সতীকে তুলিয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। যাইতে যাইতে "কি ভয় লোকভয়ে" এই গীতটী গান করিতে করিতে গিয়াছিলেন।

এদিকে সেন পরিবারে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। দেওয়ান হরিমোহন সেন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আমি নিজে পছন্দ করে যার বিবাহ দিয়ে আন্‌লাম, সেই মেয়ে এমন করে আমাদের মুখে কালী দিয়ে চলে গেল?"

পুরাকালে সতী সীতা—দেবী যেমন পতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলেন, বালিকা জগন্মোহিনীও তেমনি সংসারের সকল প্রকার সুখবিলাস এবং ধর্ম্ম-সংস্কারবাদ অবাধে উপেক্ষা করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়া যথার্থ সতীত্বেরই পরিচয় দান করিলেন। এই জন্যই পরিণামে স্বয়ং ব্রহ্মানন্দও তাঁহাকে "সতী" নামে অভিহিত করেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে শ্রীঈশা 'তো দার-পরিগ্রহ করেন নাই; নির্ব্বাণ ধর্ম্মবীর শ্রীবুদ্ধদেব এবং প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গও নিজ নিজ ধর্ম্মপত্নীকে পরি-ত্যাগ করিয়াই ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নববিধান প্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রথমেই বৈরাগ্য-অগ্নিতে সংসার কামনা একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া যথার্থ গৃহধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে সহধর্ম্মিণীসহ ধর্ম্ম সাধনার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং সতীকেও এক প্রকার অগ্নি পরীক্ষা করিয়া লইয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণী করিলেন।

ধন্য সতী জগন্মোহিনী দেবী, তিনিও এত বালিকা অবস্থাতে এই সতীত্ব সাধনার পরীক্ষাদানে সক্ষম হইলেন ও তাহাতে এমনই সিদ্ধকাম হইলেন, যে স্বামীর-চির-অনুগমন করিয়া সংসারে এক নবযুগ আগমনের পথ

খুলিয়া দিলেন। স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারে উচ্চ ধর্ম্ম সাধন হয় না, ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিধানের সংস্কার। পুরাকালে একমাত্র জনক ঋষিই কেবল সংসারে উচ্চ ধর্ম্ম সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাও আখ্যায়িকা মাত্র অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা যে সম্ভব, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মানন্দই সতী জগন্মোহিনী সহ দেখাইয়া দিলেন।

অবরোধপ্রথা প্রধান এই হিন্দুর দেশে এখন অনেক নারীই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অবরোধ-উন্মুক্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে স্বামীসহ ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, সভা-সমিতিতেও অবাধে গমনাগমন করিতেছেন, কিন্তু কেবল ধর্ম্মসাধনার্থ এই অবরোধ উন্মোচনের পথ যে সতী জগন্মোহিনী দেবীই প্রথম প্রদর্শন করিলেন ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।



স্বামীসহ নির্ব্বাসন;—মহর্ষি গৃহে ও বাসাবাটীতে বাস।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সস্ত্রীক বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়া আচার্য্যপদে বরিত হইলেন। ইহার ক্ষণকাল পরেই তাঁহার বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে পত্র পাইলেন, তিনি বাটীতে স্থান পাইবেন না। পত্রখানি পাইয়াই ব্রহ্মানন্দ মহর্ষিকে প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ পড়িয়া বলিলেন, "তাহার জন্য আর ভাবনা কি? তুমি আমার বাড়ীকে তোমার বাড়ী মনে কর, এইখানেই তুমি বাস কর।" এই বলিয়া জগন্মোহিনী দেবীকেও অন্দর মহলে মহিলাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর মহর্ষি এই নির্ব্বাসিত দম্পতীকে আপনার পুত্র ও বধূর ন্যায় সস্নেহে পালন করিতে লাগিলেন এবং আপন পুত্র কন্যাদের ন্যায় তাঁহাদেরও আহার বাসের সমুদয় সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র যেমন বনবাসী হইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে ক্ষণকাল স্থান পাইয়াছিলেন, নব সত্যপালনের জন্য সেইরূপ শ্রীব্রহ্মানন্দ সস্ত্রীক ধর্ম্মপিতা মহর্ষির

গৃহাশ্রমে স্থান পাইলেন। সতী জগন্মোহিনীও স্বামীর অনুগমন অপরাধে আত্মজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও নির্ব্বাসিতা হইলেন বটে, কিন্তু একমাত্র স্বামীসঙ্গ পাইয়াই সকল কষ্ট বহনে কৃতসংকল্প হইলেন। স্বর্গের পুণ্যময় পতিপ্রেম তাঁহার জীবন, মন, প্রাণকে পূর্ণ শোভিত করিয়াছিল; কাজেই পৃথিবীর অসার ধন, মান, সুখ, সম্পদ ত্যাগ করিতে তাঁহার সেই বালিকা হৃদয় কণা-মাত্রও দুঃখিত হইল না।

প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষিদেবের বাটীতে পৌঁছিবামাত্র বাটীর পুত্র কন্যাগণ পাল্কীর নিকটে আসিয়া জগন্মোহিনী দেবীকে অন্দরে লইয়া গেলেন। প্রধানাচার্য্য কন্যা-দিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, দেবীকে যেন তাঁহারা বিশেষরূপে যত্ন আদর করেন। এজন্য মহর্ষিদেবের কন্যা ও বধূগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার মনকে নানা প্রকারে উল্লসিত করিতে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। সতী জগন্মোহিনীও নিজগুণে অতি অল্পদিন মধ্যেই মহর্ষি পরিবারস্থ সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গুণগ্রাহী মহর্ষিদেবও তাঁহার গুণের জন্য এই সময়ে জগন্মোহিনী দেবীকে "ব্রহ্ম-নন্দিনী" নাম প্রদান করেন।

এত দিন পরে ভক্ত-বৈরাগী স্বামীও তাঁহার সতীত্বে পরাভূত হইলেন। অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা যেমন শ্রীরাম কর্ত্তৃক গৃহীতা হন, ব্রহ্মানন্দও তাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে দেখিয়া আপন নির্ব্বাসনের এই ধর্ম্মসঙ্গিনী সতীদেবীকে অধিকতর প্রণয়দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন এবং উভয়ে উভয়ের সমবেদনার সহানুভূতিকারী হইয়া নিগূঢ় প্রেমসহকারে পরস্পরের নির্ব্বাসন কষ্ট বহনে সহায় হইলেন। এদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গেও তাঁহারা উভয়েই এক গভীর অধ্যাত্ম প্রণয়যোগে আবদ্ধ হইলেন।

এইরূপে কিছু দিন মহর্ষিগৃহে বাস করিতে করিতে শ্রীকেশবচন্দ্র একপ্রকার কঠিন ক্ষতরোগে আক্রান্ত হন। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখের সহানুভূতি করিতে যাঁহার জীবন প্রেরিত, দুঃখের পর দুঃখ যে তাঁহার জীবনে ঘটিবে ইহা ত বিধাতারই নির্ব্বন্ধ।

মহর্ষির গৃহে নানা প্রকার সুচিকিৎসকের অধীনে বার বার অস্ত্রচিকিৎসা হইল, কিন্তু তথাপি শ্রীকেশবচন্দ্রের রোগ আরোগ্য হইল না; ইহাতে মাতা সারদা দেবী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মাতৃস্নেহ আর সন্তানের নির্ব্বাসন সহ্য করিতে পারিল

না, অথচ বাটীর কর্ত্তাদের ভয়ে একেবারে নিজ বাটীতেও তাঁহাকে আনিতে সাহসী হইলেন না। তবে বাটীর নিকটেই একটী বাসাবাটীতে রুগ্ন পুত্র ও পুত্রবধূকে আনাইয়া রাখিলেন এবং পুত্রের রোগের শুশ্রূষায় মা সারদা দেবী আপনিই নিযুক্ত হইলেন।

পিতা কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাইতে হইলে যেমন তৈজস ও সকলপ্রকার গৃহদ্রব্যাদি দেন, মহর্ষিদেবও তেমনি করিয়া তাঁহাদের নূতন বাসগৃহোপযোগী সমুদয় দ্রব্য দেবী জগন্মোহিনীকে দিয়া সেই বাসাবাটীতে পাঠাইলেন।

বাসাবাটীতে আসিয়া কেমন নিষ্ঠার সহিত স্বামীসেবা করিতে পারেন সতী তাহার বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেন। তিনি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কত সময় কত রাত্রি রুগ্ন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সমস্ত ক্ষণ বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখনও কেশবচন্দ্র রোগমুক্ত না হওয়াতে কি জানি কাহার পরামর্শে এক হাতুড়িয়া চিকিৎসক এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দেয়। ইহাতে তাঁহার রোগ উপশম হওয়া দূরে থাক বরং তিনি একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। এজন্য মাতার বিশেষ আগ্রহে তাঁহাকে পুনরায় স্বগৃহেই আনা হইল।

স্বগৃহে পুনরাগমন,—নবকুমার লাভ ও ধর্ম্মের জয়।

স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াই শ্রীকেশব সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় এবং মাতা ও সতীর ঐকান্তিক শুশ্রূষায় শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। অবিলম্বে পৈত্রিক সম্পত্তিরও অধিকার পাইলেন, এবং এত দিনের পর যেন পরীক্ষার মেঘও কাটিয়া গেল। ধর্ম্মের জন্য সস্ত্রীক নির্ব্বাসন ও কয়েক মাসব্যাপী দুরারোগ্য রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও অবসন্ন না হইয়া অলৌকিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অসামান্য ধর্ম্ম-পরাক্রমের পরিচয় দিয়া ব্রহ্মানন্দ আপন মহজ্জীবনেরই মহাগৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পরীক্ষার অবসানে সৌভাগ্যের উদয় হইল। সতী জগন্মোহিনী দেবী অচিরেই প্রথম নব কুমার প্রসব করিলেন এবং মহা ঘটা করিয়া ব্রহ্মানন্দ নিজ পৈত্রিক ভবনেই আপন ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে ১৭৮৪ শকের ২৮শে পৌষ জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিলেন। যে পৈত্রিক ভবন হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় সেই



শ্রী জগন্মোহিনী দেবী।

[বিবাহিত-জীবনে।]

ভবনেই ব্রাহ্মবন্ধুদের লইয়া নির্ব্বিবাদে তিনি স্বীয় ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

এই পৈত্রিক ভবনেই নবকুমারের জাতকর্ম্মের আয়োজন হইতে দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর," এই বলিয়া তিনি স্ত্রী পুত্র বালক বালিকা দাস দাসী সকলকে লইয়া তাঁহাদের বাগানবাটীতে চলিয়া গেলেন। কেবল সন্তানবৎসলা মা সারদা দেবী তাঁহার সহিত না গিয়া বাটীতেই রহিলেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দেরই জয় হইল। ব্রহ্মানন্দের দল স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই বাটী দখল করিলেন।

এই উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রেরিত শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয়ের পত্নী ও অপর দুই একটী ব্রাহ্ম মহিলা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলুটোলার বাটীতে আগমন করেন। ব্যাঙ্ক হইতে দ্বারবানগণ কর্ত্তার আদেশে আনীত হয়, কিন্তু কর্ত্তা তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিল বুঝি কেশবচন্দ্রের এই উৎসবে সাহায্য জন্যই তাহারা আনীত, এই জন্য তাহারা তাঁহারই নিকট হুকুম লইয়া সকল ঘরে পাহারা দিতে লাগিল। তাহাতে উৎসবের আড়ম্বর আরো বৃদ্ধিই হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপন পুত্রদের লইয়া যে কেবল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন তাহা নহে, অনুষ্ঠানের সমুদয় ব্যবস্থাদিও স্বয়ং করিলেন এবং আচার্য্যের কার্য্যও তিনিই করিলেন। মহর্ষি সে দিন যে প্রার্থনা করেন, তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা লিখিয়া রাখেন। আমরা এইখানেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে করুণানিধান বিশ্ববিধান বিধাতাপুরুষ! আমরা যখন যে প্রকারে অবস্থান করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে তখন সেইরূপেই রক্ষা করিয়া আপনার অপার করুণা বিস্তার করিতেছ।

"তুমি সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে আপনাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ।

"তুমি জরায়ু-সমাবৃত গর্ভকে এবং সদ্যজাত শিশুকে যে প্রকার যত্নে রক্ষা কর, তাহার উপমা আর কোথাও নাই। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা পাওয়া এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার এক একটী বিষয়েতে তোমার অপার মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে।

"যে অন্ত্রময় উদর মধ্যে এক বিন্দুমাত্রও অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে না, সেখানেও গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করিয়া পালন কর। তুমি সেই গর্ভের মধ্যে

যেন বিরলে বসিয়া স্বহস্তে তাহার ভাবি প্রয়োজন সাধন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল নিপুণরূপে রচনা কর এবং তাহার মুগ্ধকর মুখেতে শ্রীসৌন্দর্য্য সাধন কর।

"আবার যখন সে এক লোক হইতে লোকান্তরে আসিবার ন্যায় বায়ুশূন্য তিমিরাবৃত জরায়ু-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় পৃথিবীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখনো তোমার করুণা অগ্রসর হইয়া স্নেহ-রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করে। তোমার প্রেম তখন পিতামাতার মনে স্নেহরূপে অবতীর্ণ হয় এবং সুহৃদ্গণের আনন্দ-কোলাহল মধ্যে প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহারা পুত্রের মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন।

"শিশুসন্তানের প্রতি তোমার এমনি প্রেম যে, তাহার প্রতি কাহারো দ্বেষ ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার মন মোহেতে এককালে বিকৃত হইয়া না যায়, এবং যাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ হইতে দয়া এককালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা করিতে পারে না।

"তুমি বালককে সকলের স্নেহের আস্পদ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ। চুম্বক-মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধপোষ্য

বালকের মুখমণ্ডলও সেইরূপ নরনারীর স্নেহকে আকর্ষণ করে। হা জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কতই কীর্ত্তন করিব।

"তুমি যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয় জরায়ুর মধ্যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-সন্তানকে রক্ষা কর, এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য গর্ভধারিণীর উদর হইতেই তাহার ভোজন পান বিধান কর এবং অবশেষে স্বয়ং ধাত্রী হইয়া তাহার প্রসব ক্রিয়া সম্পাদন কর, তখন সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণ ও পোষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

"তুমি আমাদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হও না। শৈশবাবস্থায় যখন আমাদের আত্ম-রক্ষার ও আত্ম-পোষণের কোন শক্তিই ছিল না, যখন আমরা ক্ষুৎপিপাসাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন-পান আহরণ করিতে পারিতাম না, যখন আমরা অতি লঘু বিপদ্‌কেও অতিক্রম করিতে অক্ষম ছিলাম, তখন তুমি পিতামাতার মনে কেবল এক স্নেহ দিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়াছ।

"যখন আমরা তোমাকে জানিতেও পারি নাই, এবং তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেও পারি নাই, তখনও

তোমার করুণা মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে; অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাদের বিশুদ্ধ প্রীতি গ্রহণ কর।"

ধন্য ভক্ত-বৎসল ভগবান্! এইরূপে কলুটোলার যে বাটী হইতে ধর্ম্মের জন্য ব্রহ্মানন্দকে তাড়িত হইতে হয়, সেই গৃহেই মহা সমারোহের সহিত তিনি প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হইলেন, এবং সেই গৃহেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান দুর্গ স্থাপন করিলেন। ইহার পর হইতে পরিবারস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ আর তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য কখনও নিপীড়ন করেন নাই। এইখানেই তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে সকল প্রকার উৎসব অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে লাগিল।



ব্রহ্মানন্দের "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" ও "সুখী পরিবার।"

এই সময় উপদেশ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রচার দ্বারায় শ্রীব্রহ্মানন্দ যেমন সাধারণে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, আপন সহধর্ম্মিণীরও শিক্ষা উন্নতি বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারের সঙ্গে প্রধানতঃ আপনার সহধর্ম্মিণীর শিক্ষার জন্যও এই সময় তিনি "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" ও "সুখী পরিবার" নামে দুই খানি অতি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন।

পুরাকালে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যেমন আপন সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে নানাপ্রকার ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দও তেমনি "স্ত্রীর প্রতি উপদেশে" স্ত্রীর কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে অতি সুন্দর উপদেশ সকল সহজ ভাষায় বিবৃত করেন। "সুখী পরিবার" পুস্তিকাতেও আদর্শ সুখী পরিবারের একটী সুন্দর ছবি অঙ্কিত করেন। এই দুইখানি প্রধানতঃ ব্রহ্মানন্দের আপন স্ত্রীর শিক্ষার জন্য লিখিত হইলেও ইহাতে সর্ব্ব সাধারণ নরনারীর বিশেষতঃ নারীগণের শিক্ষণীয় বিষয়

যথেষ্টই আছে। এই নিমিত্ত এই দুইখানি পুস্তিকার সার সংকলন করিয়া আমরা এইখানেই প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীকেশবচন্দ্রের ভাষা এমনই সুমিষ্ট ও পুস্তিকা দুইটীর ভাব এতই সুন্দর যে সমগ্র পুস্তিকাই উদ্ধৃত করিয়া দিতে আমাদের লোভ হয়; তবে তাহাতে এ পুস্তকের কলেবর পাছে যথেষ্ট বাড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় ব্রহ্মানন্দের ভাষাতেই পুস্তিকা দুইটীর সমুদয় সার অংশ উদ্ধৃত করিলাম। তখন হইতেই স্ত্রীর প্রতি ব্রহ্মানন্দের কি নিগূঢ় প্রণয় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ছিল তাহাও ইহাতে বুঝা যাইবে।

[উপক্রমণিকা]—"যেদিন তোমার সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছি, সেইদিন অবধি আমার হস্তে এক গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। পরমেশ্বর তোমাকে আমার হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া তোমার মঙ্গল সাধন করিতে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার শরীর মন আত্মাকে সত্যের পথে কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে হইবে।

"যাহাতে এই কার্য্য তাঁহার প্রসাদে সুসম্পন্ন করিতে পারি এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

"তুমি সত্যস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনার হিতের জন্য আমার এই উপদেশগুলি গ্রহণ কর,

যাবজ্জীবন ইহা পালন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল বিধান করুন এবং তোমার হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করুন।"

[প্রথম উপদেশ]—"তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, তুমি সর্ব্বদা এই বিশ্বাসটী হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে যে আমাদের সম্বন্ধ সাংসারিক সম্বন্ধ নহে।

"ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বদ্ধ হইয়া চিরজীবন পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিব এবং উভয়ে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করতঃ তাঁহার আদেশ অনুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

"ধন মান প্রভৃতি নীচ লক্ষ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই পরম পরিশুদ্ধ পিতার কার্য্যসাধনে আমরা যেন সর্ব্বদা যত্নশীল থাকি।

"একত্র হইয়া আনন্দ মনে চিরদিন তাঁহার উপাসনা করিব, একত্র তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করিব, একত্র তাঁহার চরণসেবা করিব, একত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া জীবন সার্থক করিব ইহাই যেন নিয়ত আমাদের উদ্দেশ্য থাকে।

"আমাদের সংসার যেন ধর্ম্মের সংসার হয়।

"আমাদের সংসার যেন বিষয় কোলাহল বিষয় জঞ্জাল শূন্য হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে সুশাসিত হয়, তাঁহার সত্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার আনন্দরসে প্লাবিত হয়।

"স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী; ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য ধর্ম্মই আমাদের বন্ধন, ধর্ম্মই আমাদের চির-জীবনের কার্য্য। ধর্ম্মের পথে তুমি আমার সহায় ও সহচরী হইবে।"

[দ্বিতীয় উপদেশ]—"তুমি সেই একমাত্র সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।

"তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি প্রাণস্বরূপ, তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তিনি অনন্ত, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিত্য, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা।

"সেই সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, নিরবয়ব, জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টা ও জগন্নিয়ন্তা পরমাত্মাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

"বিশ্বাসই ধর্ম্মের জীবন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রথম সোপান: জীবন গেলেও এ বিশ্বাসকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।"

[তৃতীয় উপদেশ]—"বিশ্বাসের পর প্রীতি। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিলে, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার সহিত যোগ

নিবদ্ধ করিলে, এখন তাঁহাকে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি অর্পণ কর। তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া তোমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর; যাবজ্জীবন তাঁহার সহিত প্রীতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাক।

"যতই তাঁহাকে প্রীতি করিবে ততই তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিবে। সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য বিষয়ে আর প্রীতি স্থাপন করিও না।

"ঈশ্বরকে প্রীতি করিলেই সকল মনুষ্যের প্রতি প্রীতিস্রোত প্রবাহিত হইবে। স্রষ্টার উপরে প্রীতি হইলে তাঁহার সৃষ্টির প্রতিও প্রীতি হইবে। তাঁহাকে পিতা বলিয়া প্রীতিদান করিলে সকল লোককে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া প্রীতি করিতে হইবে।

"কি ধনী কি দরিদ্র সকল ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ প্রীতি-নয়নে দেখিবে। সকলের সহিত অকপট প্রেমভাবে মিলিত হইয়া পরম পিতার প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিবে।"

[চতুর্থ উপদেশ]—"যথার্থ প্রীতি থাকিলে প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই উদিত হয়।

"যদি ঈশ্বরেতে প্রীতি থাকে এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে প্রীতি শূন্য কপট প্রীতি; তাহা কখনই যথার্থ প্রীতি নহে।

"শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি তাঁহার প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিবে। তিনি যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

"তাঁহার যদি প্রিয় হয় আর তাহাতে অনেক কষ্ট ও বিঘ্ন থাকে তথাপি তাহা সমাধা করিবে; যদি অপ্রিয় হয় অথচ সুখদায়ক হয় তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না।

"ঈশ্বর আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন কেবল ইহারই জন্য যে, আমরা তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে আমাদের যাহা কিছু সকলই নিয়োগ করিব।

"ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন তাহাকে কর্ত্তব্য বলে; যাহা তাঁহার আদিষ্ট নহে তাহা অকর্ত্তব্য। মনুষ্যের কর্ত্তব্য ত্রিবিধ। ১। ঈশ্বরের প্রতি, ২। অন্য লোকের প্রতি, ৩। আপনার প্রতি।

"তুমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরেতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রীতিদান করিবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য যত্নপূর্ব্বক সাধন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিবে।"

[পঞ্চম উপদেশ]—"ঈশ্বরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি নিয়মিতরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে।

উপাসনা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

"যতই তাঁহার উপাসনা করিবে ততই উন্নত ও পবিত্র হইবে, ততই সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবে। উপাসনাতেই আমাদের মহত্ত্ব।

"উপাসনার তিন অঙ্গ। ১। আরাধনা, ২। কৃতজ্ঞতা, ৩। প্রার্থনা। ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ভাব স্মরণ করতঃ তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিবে। তিনি আমাদের উপরে নিয়ত অজস্র করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করিবে। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে।"

[ষষ্ঠ উপদেশ]—"উপাসনার প্রধান অঙ্গ প্রার্থনা, প্রার্থনা না করিলে ধর্ম্মের কিছুই সিদ্ধ হয় না ; সাধকেরা ইহাকে ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

"শিশু সন্তান যেমন ক্ষুধার্ত্ত হইলে জননীর নিকট রোদন করে, আমরা তেমনি সংসারের ভয়ে ভীত হইলে বা শোকে ব্যাকুল হইলে বা পাপে মুহ্যমান হইলে সেই পরম পিতার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করি।

"সংসারের পাপতাপ হইতে কেবল তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, ধর্ম্মের পথে তিনিই কেবল উন্নত করিতে পারেন। তিনিই একমাত্র সহায়, তিনিই বল, তিনিই আশা।

"কেহ কেহ বলেন যে, কেবল আপনার চেষ্টায় আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বিষম ভ্রম। আপনার যত্ন ও পরিশ্রম ত চাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সরলান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকট ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাঁহার সাহায্য বিনা তাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব।

"মুখে বলাকেই কি প্রার্থনা বলে? প্রার্থনা অন্তরে ইহা আত্মার ক্রিয়া; এ প্রকার প্রার্থনা কখনই বিফল হয় না।

"প্রার্থনা আমাদিগের পরম বন্ধু; তিনি আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া সংসারের মোহ পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া অল্পে অল্পে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যান।

"প্রার্থনা অমূল্য ধন। প্রার্থনা ধর্ম্ম-সংগ্রামের বর্ম্ম, পাপ-বিকারের ঔষধ, স্বর্গের সোপান, তাপিত হৃদয়ের সান্ত্বনা-বারি, নিরাশ্রয় আত্মার চিরসুহৃদ্। প্রার্থনা আমাদিগের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় প্রার্থনা।

তোমার যদি সকল যায় তথাপি এই অমূল্য রত্নকে পরিত্যাগ করিও না।

"ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে, প্রার্থনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। তোমাকে বার বার বলিতেছি—সাবধান কখন প্রার্থনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।"

[সপ্তম উপদেশ]—"শরীরকে সুস্থ রাখিবে, বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে এবং আত্মার সাধুভাব সকলকে প্রস্ফুটিত করিয়া সাধ্বী হইবে—আপনার প্রতি এই তিনটী কর্ত্তব্য; ইহা সাধন করিলে প্রকৃত মঙ্গল জানিবে।

"যদিও শরীর অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর, ইহার প্রতি অযত্ন বা অবহেলা করিও না, যে হেতুক ইহার অভ্যন্তরে আত্মা স্থিতি করিতেছে।

"শরীর সুস্থ ও সবল হইলে মনের স্ফুর্ত্তি ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হয় এবং আমরা ধর্ম্মের আদেশ সকল যথাবিহিত আয়াস উৎসাহ ও বল সহকারে সম্পন্ন করিতে পারি।

"অতএব আমরণ যত্নপূর্ব্বক শরীরকে রক্ষা করিবে ও ইহার সেবা করিবে। যাহাতে ইহা দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত

হয় এ প্রকার কার্য্য করিবে না, অনর্থক ইহাকে কষ্ট দিবে না। "মলিন বস্ত্র পরিধান, দুর্গন্ধ বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার, আলস্য, রাত্রিজাগরণ, এ সকল রোগ ও দুর্ব্বলতার কারণ হইতে বিরত থাকিবে। আহার, পরিশ্রম ও বিশ্রাম এই তিন বিষয়ে পরিমিতাচারী হইবে।

"উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম সহকারে বলিষ্ঠ শরীরকে রাখিবে। শরীর সুস্থ ও সবল হইলে ধর্ম্মের পথে তোমার সহায় হইবে।

[অষ্টম উপদেশ]—"শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করিতে যেমন যত্ন আবশ্যক, মানসিক বৃত্তিগুলিকেও সেইরূপ যত্নের সহিত মার্জ্জিত করা কর্ত্তব্য।

"অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার হইতে মনকে মুক্ত করিয়া উন্নত বুদ্ধিসহকারে নানা প্রকার হিতজনক তত্ত্ব সঞ্চয় করিবে।

"বিদ্যাবিষয়ে নরনারী উভয়েরই অধিকার আছে। পরমেশ্বর যাহাকে বুদ্ধি দিয়াছেন তাহাকেই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

"অতএব বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া অবকাশ পাইলে বিদ্যাধ্যয়নপূর্ব্বক নূতন নূতন ভাব সকল অর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবে।

"পুরুষেরা যে সকল কঠোর ও কঠিন জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তৎসমুদয় বিষয়ে তোমাকে নিযুক্ত হইতে আমি অনুরোধ করি না, তোমার আপনার স্বভাব ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযোগী জ্ঞান দ্বারা স্বীয় কল্যাণ সাধনে যত্নবতী হইবে।

"সময়ে সময়ে শিল্প বিদ্যার অনুশীলন করা ভাল, উহা স্ত্রী জাতির বিশেষ উপযোগী।

"একদিকে যেমন আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করা বিধেয়, তেমনি আবার কেবল দিবানিশি পুস্তকে বদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নহে।

"গৃহকার্য্যের প্রতি অবহেলা করিও না, বরং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। গৃহের কর্ত্রী হইয়া সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তোমার বিশেষ কার্য্য।

"গৃহকার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, যাহাতে কিছুই বিশৃঙ্খল না থাকে, ধনের অপব্যয় না হয়, সন্তানেরা যথারূপে লালিত পালিত হয়, এ সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিবে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিবে।

"গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হওয়া স্ত্রীজাতির একটী প্রধান কর্ত্তব্য।"

[নবম উপদেশ]—"জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহার চরিত্র মন্দ, তাহার অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বুদ্ধিও কোন কার্য্যের নহে।

"ধর্ম্মের অনুচর হওয়াই জ্ঞানের গৌরব।

"মনের কুপ্রবৃত্তি সকলকে সংযম করিয়া পাপ চিন্তা, পাপালোচনা ও পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবে।

"সাধু গুণ সম্পন্না হইবে ও সদাচারা হইবে। মন এবং বাক্য ও কার্য্য সকল বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।

"সমাহিত ও শান্তচিত্ত হইবে ও সংযতেন্দ্রিয়া হইবে। সংসারের দুঃখ বিপদে যেন মন বিচলিত বা অবসন্ন না হয়। তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা সহকারে সকল কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিবে ও বারংবার আঘাত পাইলেও অধীরা হইবে না।

"কর্ত্তব্যজ্ঞানকে জাগ্রৎ রাখিয়া সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় দমন করিবে, এবং কদাপি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইবে না।

"মনঃসংযম করিয়া দুঃখ পাপ হইতে আপনাকে যত্ন পূর্ব্বক নিয়ত রক্ষা করিবে।

"সত্য কথা কহিবে এবং মৃদুভাষিণী হইবে। বহুল অর্থলাভের আশা থাকিলেও মিথ্যা কহিবে না; সমুদয় সম্পত্তি হানির সম্ভাবনা থাকিলেও মিথ্যা কহিবে না।

"সকলকে প্রিয় কথা কহিবে ,অপ্রিয় কঠোর বাক্য মুখে আনিবে না। কটু কথা, পরনিন্দা এ সকল যেন তোমার কোমল রসনাকে কলুষিত না করে। প্রিয় বচন দ্বারা শত্রুরও প্রীতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

"ক্রোধ ও হিংসা ভয়ানক রিপু ; ইহাদিগকে সর্ব্বদা দূরে রাখিবে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি আপনার ও পরের হিত দেখিতে পায় না।

"অন্যের দোষ দেখিলে শান্তভাবে প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করিবে। ক্ষমা আত্মার পরম ভূষণ।

"পরহিংসা অতি নীচ-প্রকৃতির লক্ষণ। এ কুটিলভাব যেন তোমার হৃদয়কে দূষিত না করে।

"অন্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ বা সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া কদাপি দ্বেষ করিবে না ; আপনার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

"বেশ বিন্যাস কি স্বর্ণাভরণে সুশোভিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাতে গৌরব কি ? জ্ঞান ধর্ম্মে প্রাধান্য লাভ করাই যথার্থ গৌরব ও প্রশংসার বিষয়। মনের সৌন্দর্য্যের সহিত কি বাহিরের লাবণ্যের উপমা হয় ? কিসে তোমার সমবয়স্কা বন্ধুদিগের অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবতী ও জ্ঞানবতী হইবে ইহাই তোমার লক্ষ্য হউক।

"দ্বেষ, হিংসা, নীচ লক্ষ্য সকল পরিত্যাগ কর; পর সুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী হইয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবে।

"ধনের সদ্ব্যয় করিবে বৃথা অপব্যয় করিবে না, কৃপণতাও অভ্যাস করিবে না। আপনার ও পরিবারের ও জনসমাজের মঙ্গলের জন্য অর্থ ব্যয় করিবে।

"সুশীলা ও লজ্জাবতী হইবে। পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে কোমল প্রকৃতি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে প্রকৃতিকে কখন বিকৃত করিবে না, তাহাতেই তোমাদের সৌন্দর্য্য; বিনয় ও সুশীলতাই নারীর আভরণ।

"চাঞ্চল্য, রুদ্রভাব, কঠোর ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা, অপ্রিয় বচন এ সকল পরিত্যাগ করিবে; এবং সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সুশীলা ও শান্ত স্বভাব থাকিবে।

"জ্ঞানধর্ম্মে তোমার যাহা কিছু উন্নতি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই পরিমাণে বিনয় ও লজ্জা থাকে।"

[দশম উপদেশ]—"পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি; পতির প্রতি ঐকান্তিক ও নিঃস্বার্থ প্রণয়; ভ্রাতা, ভগিনীর প্রতি সদ্ভাব ও প্রীতি; পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত কর্ত্তব্য।

"সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর প্রতি দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য—ন্যায় ও দয়া।

"পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, অন্যের শরীর বা মনে কষ্ট দিবে না। অন্যের অপবাদ ঘোষণা করিবে না, অন্যের উন্নতির পথে বাধা দিবে না, অন্যকে পাপে প্রবৃত্ত করাইবে না।

"অর্থের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা ও প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা পরোপকার করা যাইতে পারে।

"রোগীকে ঔষধ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করিয়া তাহাদের শারীরিক কষ্ট নিবারণ করিবে।

"সদুপদেশ দ্বারা ভ্রমাচ্ছন্ন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিবে।

"তোমাদের শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যদি কাহারো কষ্টের শান্তি হয় তাহাতে সঙ্কুচিত হইবে না। বিবিধ উপায়ে তোমার বল বুদ্ধি ও ধন পরোপকারে নিয়োগ করিয়া ইহজীবনকে সার্থক করিবে।

"সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত বা যশোলাভের জন্য দান করিবে না; এ প্রকার দান স্বার্থপরতা মাত্র।"

[একাদশ উপদেশ]—"স্ত্রীজাতির যে প্রকার কোমল ও শান্ত স্বভাব, তাহাতে জনসমাজে তোমাদিগের অতি সাবধান হইয়া অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। সংসারে রাশি রাশি প্রলোভন মধ্যে আত্মরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক; অতএব যত্নপূর্ব্বক স্বাধীনতা রত্নকে রক্ষা করিবে।

"যথার্থ স্বাধীনতা কি? না, ঈশ্বরের অধীন হওয়া। ইচ্ছাপূর্ব্বক সমুদয় শরীর মন তাঁহার নিয়মের অধীন করা, সম্পূর্ণরূপে তাহার দাস হওয়া।

"স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতাই বলা যায় না, তাহাই যথার্থ অধীনতা।

"যিনি আপনার ইচ্ছাতে ঈশ্বরের পথে, সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে সর্ব্বস্ব নিয়োগ করেন, এবং স্বীয় মঙ্গল সাধনের জন্য কর্ত্তৃত্ব সহকারে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেন তিনিই যথার্থ স্বাধীন।

"যিনি কুপ্রবৃত্তি সকলকে বশে রাখেন, ইন্দ্রিয়ের ভৃত্য না হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অনুচর করেন, যিনি লোকানুরোধে বা লোকভয়ে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করেন না, যিনি অন্যের কথায় আপনার আত্মার প্রভুত্ব বিক্রয় করেন না, তিনিই স্বাধীন। এই স্বাধীনতাই মনুষ্য

জীবনের গৌরব। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ইহাতে সমান অধিকার।

"স্বাধীনতা না থাকিলে মনুষ্যত্বই থাকে না বলা যাইতে পারে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের দাস বা ঘটনার দাস হওয়াই পশুভাব।

"আপনার উপরে যত কর্ত্তৃত্ব, ততই ধর্ম্ম ও সেই পরিমাণেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অতএব সকল প্রকার দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া ধর্ম্মের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবে।

"যাহা অধর্ম্ম সহস্র লোক অনুরোধ করিলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না; যাহা সৎকর্ম্ম তাহাতে সকলের নিন্দাভাজন হইতে হইলেও তাহা সম্পন্ন করিবে।

"দেশের আচার ব্যবহার মনে করিয়াও কার্য্য করিবে না, লোকের আদর অনাদরের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে না। আবার স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহারও করিবে না।

"ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু জানিবে। তুমি তাঁহারই দাসী তাঁহারই আজ্ঞা বহন করিবে, তাঁহারই কার্য্য সাধন করিবে।"

[দ্বাদশ উপদেশ]—"যত্নের সহিত সন্তানদিগকে লালন পালন করিবে এবং তাহাদের শরীর ও আত্মা উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

"মাতা পরম গুরু, মাতার উপদেশ যেমন শিশু-সন্তানের কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া চিরদিন মঙ্গল ফল উৎপাদন করে এমন আর কিছুতেই নয়।

"যেমন রোগ কষ্ট যন্ত্রণা হইতে তাহাদের শরীরকে রক্ষা করিবে, সেইরূপ আত্মাকেও সংসারের প্রলোভন ও ভয় হইতে দূরে রাখিবে।

"সন্তান যাহাতে সবলকায় ও সুস্থ হয় এবং সাধু ও জ্ঞানবান্ হয় এরূপ চেষ্টা করিবে। তোমার স্নেহ মমতা যেন তাহার উন্নতির বিরোধী না হয়। বাল্য-কালে তাহার কোমল হৃদয়ে সুনীতি সকল রোপণ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"বালক মাতার কথায় বা দৃষ্টান্তে যে সকল কুসংস্কার বা দোষে পতিত হয় তাহা উন্মূলন করা অত্যন্ত কঠিন।

"মাতা যদি সন্তানকে অন্যায় আদর করেন এবং সহস্র দোষ দেখিলেও বিরক্ত না হন, তাহা হইলে সে বালক শিথিল হৃদয় হইয়া অবশেষে নানা দোষে পতিত হয়। অনেক অনেক ব্যক্তি আবার কেবল মাতার উপদেশে জ্ঞানধর্ম্মে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।

"অতএব অতি যত্নের সহিত সন্তানদিগকে কুপথ ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিবে এবং বাল্যকালে তাহাদের কোমল মনে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অঙ্কুর নিহিত করিবে।

"কাহারো সহিত কখন বিবাদ করিতে দেখিলে তাহা হইতে বিরত করাইবে। অশ্লীল বা কটু কথা কহিতে শুনিলে নিবারণ করিবে, কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবে, বেশভূষার প্রতি অনুরক্ত হইতে দিবে না। সময়ে সময়ে উন্নতির পরিচয় লইবে, মনোরঞ্জন উপন্যাস দ্বারা সত্নপদেশ দিবে, কোন দোষ দেখিলে স্নেহের সহিত হিত শিক্ষা দিবে এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপন করিবে।

"ইহা হইলে তোমাকে মাতা বলিয়া প্রীতি করিতে করিতে ঈশ্বরকে পরম মাতা বলিয়া সহজেই প্রীতি করিতে শিখিবে এবং তোমার স্নেহে ঈশ্বরের অতুল স্নেহ উপলব্ধি করিবে।

"কেমন সুন্দর সেই পরিবার, যে পরিবারের পুত্র কন্যারা জননীর বিশুদ্ধ স্নেহে বশীভূত হইয়া এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে সুশিক্ষিত হইয়া পরম মাতার সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।"

["সুখী পরিবার।"]—"আমাদের কেমন সুখের পরিবার! আমাদের কেমন শান্তিনিকেতন! এখানে কলহ বিবাদ নাই। অপ্রণয় শত্রুতা নাই, সকলের মধ্যে কেমন সুমিষ্ট প্রীতি ও শান্তি!

"আমাদের গৃহদেবতার শাসনে আমরা কেমন কুশলে দিন যাপন করিতেছি! ছোট বড় সকলেই সুখী। স্ত্রী পুরুষ, ভাই ভগ্নী সকলেরই মুখ প্রসন্ন।

"আমরা দুই বেলা হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে এই স্বর্গীয় সুখের জন্য ধন্যবাদ করিয়া থাকি। পৃথিবীতে এত আনন্দ! জগতে এমন স্বর্গ! ধন্য দয়াময়!

"আমাদের এত সুখের প্রধান কারণ এই যে, ঈশ্বর আমাদের প্রভু ও বিধাতা। এ পরিবার তাঁহারই পরিবার।

"আমরা আর কাহারও কথায় চলি না। আর কাহাকেও মানি না। আমরা মানুষের মতে বা সংসারের তুষ্টির জন্য কোন কার্য্য করি না। আমরা যাঁহার দাস দাসী তাঁহারই আজ্ঞাধীন।

"আমরা তাঁহাকে চিরজীবনের মত দাসত্ব খত লিখিয়া দিয়াছি। তাহাতে এই লেখা আছে—"তুমি উপাস্য আমরা উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আমরা

প্রজা, তুমি প্রভু আমরা ভৃত্য, তুমি পিতা আমরা সন্তান; এই সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিতেছি। অবস্থাভেদে আমাদের মতান্তর বা ভাবান্তর হইবে না। আমরা অনন্তকালের জন্য তোমারই হইয়া রহিলাম। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গতি আমাদের মুক্তি সকলই তুমি। আমরা তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না।"

"আমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি না। মরি আর বাঁচি অঙ্গীকার কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারি না। ঐ অঙ্গীকার পালনই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে।

"প্রতিদিন আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই একমাত্র উপাস্য দেবের পূজা করি। আমরা কোন সৃষ্ট বস্তু বা জীবের আরাধনা করি না, কোন সাধু মনুষ্যকেও পরিত্রাণার্থী হইয়া অর্চ্চনা করি না।

"সত্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তাঁহার উপাসনা করি। উপাসনাতে বড় সুখ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

"উপাসনা মন্দিরে কি মনোহর দৃশ্য! চারিদিকে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ মধ্যে পুণ্যময় প্রেমময় ঈশ্বর, সকলে তাঁহাকে পূজা উপহার দিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। কখন গম্ভীর ধ্যানে নিমগ্ন, কখন সকলে মিলিত হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, কখন বা সুমধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রুজলে সন্তরণ করিতেছেন।

"এতদ্ব্যতীত কখন কখন কেহ একাকী নির্জ্জনে ব্রহ্ম-ধ্যান করেন অথবা প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে ব্রহ্ম সাধন করেন। কখন বা পাঁচ জন একত্র হইয়া ঈশ্বর প্রেমের আলোচনা করেন। এইরূপে দিন দিন উপাস্য উপাসকের যোগ গাঢ়তর ও মিষ্টতর হইতে থাকে।

"এই পরিবারে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধও অত্যন্ত প্রবল। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনকে কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার মুখের কথা ভিন্ন আমাদের আর শাস্ত্র নাই।

"আমরা পৃথিবীর কোন লোককে গুরু বলি না, কোন পুস্তককে শাস্ত্র বলি না, অন্ধ হইয়া কোন মত বা সম্প্রদায়ের অনুসরণ করি না। ঈশ্বর যতক্ষণ না বলেন ততক্ষণ আমরা কোন কথা, মনুষ্যের অনুরোধে বিশ্বাস করি না। সন্দেহ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, পথ

হারা হইলে তাঁহাকে ডাকি, তিনি গুরু হইয়া সকল প্রশ্নের মীমাংসা করেন, এবং সকল অন্ধকার দূর করেন।

"আমাদের গুরু সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আমাদের মুক্তির জন্য নূতন নূতন মন্ত্র শিখাইয়া দেন ও উপায় বিধান করেন। যখন যেমন অবস্থা হয় তখন তাহার উপযোগী একটি নূতন বিধান প্রকাশ করেন। যতই আমরা উন্নত হই ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর মন্ত্রে তিনি আমাদিগকে দীক্ষিত করেন।

"আমাদের গুরু অতি সহজভাষায় উপদেশ দেন এবং যাহার যেমন ক্ষমতা ও অধিকার তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দেন। তাঁহার কথায় যেমন জ্ঞান জন্মে তেমনি হৃদয় জুড়ায়। তাঁহার কথায় ভ্রম পাপ দুঃখ সকলি চলিয়া যায়।

"এমন গুরু পাইয়া আমরা নির্ভয় হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা সংসারভয়, পাপভয়, মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

"ঈশ্বরকে আমরা রাজা ও প্রভু বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করি। তিনি আমাদের সমস্ত জীবনের শাসন-কর্ত্তা। সংসারের যাবতীয় কার্য্যে আমরা তাঁহার দাসত্ব করি। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারই অধীন

হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। আমাদের আর কেহ প্রভু নাই।

"রাজা হইয়া তিনি কতকগুলি রাজবিধি প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে আমাদের চলিতে হয়। একটু কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম হইলে যথা পরিমাণ দণ্ডভোগ করিতে হয়, ইহার অন্যথা কদাপি হয় না।

"সংসারের লোকে যাহা বলে অথবা নিজের বুদ্ধিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা আমাদের করণীয় নহে। লোকভয়ে বা সুখলোভে আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি না।

"ঈশ্বর প্রভু ও নেতা হইয়া তাঁহার কার্য্যে আমাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমরা কে কি জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি তাহা তিনি স্পষ্টরূপে প্রত্যেককে বলিয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে জীবনের ঐ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, তদুপযোগী আদেশ সর্ব্বদা বিধান করিতেছেন।

"কি করিব, কোথায় যাইব, কিরূপে দিন যাপন করিব, প্রলোভন বা বিপদের সময় কি করা উচিত, এ সমুদায় বিশেষরূপে তিনি বলিয়া দেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমাদের সমস্ত দিন চলিতে হয়। আমরা সকলে তাঁহার চিরক্রীত দাস।

"যেমন তাঁর পূজা করিয়া আমরা সুখী হই, তেমনি তাঁর আজ্ঞা পালন করিয়া সমস্ত দিন সুখে থাকি। এই পরিবার দাসদাসী পরিবার।

"তাঁর সঙ্গে আর একটী মধুর সম্পর্ক আছে। তিনি আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। অন্ন, বস্ত্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম সকলই তিনি দিতেছেন। রোগে কাতর হইলে তিনি ঔষধ বিধান করেন; শোকে আকুল হইলে তিনি সান্ত্বনা করেন ও চক্ষের জল মুছাইয়া দেন। বিপদকালে তিনি সহায়তা করেন, প্রলোভনে পড়িলে রক্ষা করেন। যখনি ডাকি, সেই সন্তান বৎসল তখনি কাছে আসিয়া বসেন, এবং বিবিধ উপায়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

"কেবল যে সাধারণরূপে তিনি আমাদের উপকার করিতেছেন তাহা নহে, প্রত্যেককে তিনি বিশেষরূপে স্নেহ করেন।

"আমাদের প্রতিজনকে তিনি যেরূপ যত্ন সহকারে সর্ব্বদা রক্ষা ও পালন করিতেছেন এবং ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন তাহা ভাবিলে হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরেনা। যখন যাহার যাহা প্রয়োজন হয় কোথা হইতে তিনি আনিয়া দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন।

"কার্য্যেতে তো তিনি দয়া দেখাইতেছেন। আবার সময়ে সময়ে সন্তানদিগকে নিকটে ডাকিয়া গোপনে তিনি যেরূপ বাৎসল্য ও প্রেম প্রদর্শন করেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

"পিতার মুখের সেই কথাগুলি কি সুমিষ্ট ও মধুর, তাঁহার দর্শন কি মনোহর, তাঁহার সহবাস কি সুখময়! ইচ্ছা হয় প্রিয়তম পিতার কাছে সর্ব্বদা বসিয়া থাকি।

"ঈশ্বরের সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক থাকাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটী বিশুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আমরা পরস্পরকে ভাই ভগ্নী মনে করিয়া ভালবাসি ও সেবা করি।

"আমরা কাহাকেও পর ভাবিতে পারি না, সকলে আত্মীয়, কেহ যে স্বার্থপর হইয়া এ পরিবার মধ্যে কেবল আপনার হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন এবং অপরের প্রতি উদাসীন হইবেন তাহা অসম্ভব। পরস্পরের মঙ্গলে অনুরাগী হইতেই হইবে, এবং দয়া ও ভালবাসার সহিত পরসেবায় সদা রত থাকিতেই হইবে।

"আমরা এক-হৃদয় ও এক-প্রাণ, অপরের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল এবং নিজের মঙ্গলে সাধারণের মঙ্গল।

"সকলে মিলিয়া পিতার সেবা করিয়া সুখী হইব, এবং তাঁহার প্রসাদে সকলে একত্র হইয়া স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিব এই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং আমরা পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও ছাড়িতে পারি না।

"ঈশ্বর বলিয়াছেন যে ভ্রাতা ভগ্নীদের পদানত না হইলে আমাদের কাহারও পরিত্রাণ নাই।

"এ পরিবারে সকলের সঙ্গে সকলের মিল এবং সকলেই পরস্পরের সেবাতে নিয়ত নিযুক্ত। অন্যকে সুখী করিতে পারিলে আমাদের বড় সুখ হয়।

"আমাদের পরিবারে পরস্পরের প্রতি পাপাচার নিষিদ্ধ। কাম ক্রোধ হিংসা দম্ভ প্রভৃতি রিপুসকল এখানে উপদ্রব করিতে পারে না।

"আমাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ নিষিদ্ধ, এখানে সর্ব্ব-প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা নিবারিত। এখানে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা নিষিদ্ধ। শতবার আক্রান্ত বা অপমানিত হইলেও আক্রমণ বা অপমান করিবার নিয়ম নাই।

"শান্তচিত্ত ও সহিষ্ণু হইয়া দোষী ভ্রাতাকে বারম্বার ক্ষমা করিতে হইবে এবং তাহার অনেক দোষ দেখিলেও কেহ প্রেম বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্ষমা দ্বারা পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের উচিত নহে।

"দোষী ব্যক্তি অনুতপ্ত না হইলে এবং দোষ সংশোধনের চেষ্টা না করিলে আমাদের ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করেন না, কিন্তু প্রেম দ্বারা শাসন করিয়া তাহাকে ভাল করেন। আমাদিগকেও তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

"মতভেদই হউক আর কোন দোষই দৃষ্ট হউক, আমরা কাহাকেও ক্রোধ পরবশ হইয়া ছাড়িব না, কিন্তু সর্ব্বদা ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে সংশোধন করিব, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছি; এ অঙ্গীকার অলঙ্ঘনীয়। নিত্যপ্রেম, নিত্যশান্তি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

"এ পরিবারের নর নারীরা পরস্পরের প্রতি কখন অপবিত্রভাবে দৃষ্টি করিতে পারেন না। চক্ষে বা হৃদয়ে সে ভাব ক্ষণকালের জন্য প্রবেশ করা মহা পাপ।

"পুরুষেরা নারীদিগকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া শ্রদ্ধা করেন এবং নারীরা পুরুষদিগকে ব্রহ্মতনয় জানিয়া শ্রদ্ধা করেন। পরস্পরকে দেখিবামাত্র হৃদয়ে অতি উচ্চ ভাব ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত প্রেমের উদয় হয়।

"শারীরিক সৌন্দর্য্যে রচয়িতার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, এবং ভগ্নীদিগের কোমল প্রকৃতি দর্শনে ও চিন্তনে স্বর্গীয় জননীর বিশুদ্ধ কোমলতা স্মরণ হয়।

"নরনারীর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নৈকট্য ও নির্ম্মল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে অযথা ঘনিষ্ঠতা নাই।

"আমাদের মধ্যে এমন সকল সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে যদ্দ্বারা বাহ্যিক ব্যবহারে আমরা প্রীতির নৈকট্য এবং শ্রদ্ধার দূরতা উভয়ই রক্ষা করিতে পারি।

"এখানে স্বামী স্ত্রীরাও উচ্চ ধর্ম্ম সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁহারা পুরাতন উদ্বাহ সংস্কার করিয়া উচ্চতর প্রণয় সহকারে স্বর্গীয় রীতিতে পরস্পরকে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন এবং পবিত্র দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

"এ পরিবারে অহঙ্কার নিষিদ্ধ। কেহ আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে বড় মনে করিয়া অপরকে ঘৃণা করিতে পারেন না। বড়ই হউন আর ছোটই হউন বিনীতভাবে সকলের পদানত দাস হইয়া থাকিতেই হইবে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর চরণ সেবা আমাদের ব্রত, কেহ ইহা অতিক্রম করিতে পারেন না।

"আমাদের মধ্যে যে তারতম্য নাই তাহা নহে। কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে উচ্চ, এবং তাঁহাদিগকে সকলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন ও সমাদর করেন। কিন্তু তাঁহারাও সেবক।

"আমাদের মধ্যে কাহারও জ্ঞান অধিক, কাহারও প্রেম ভক্তি অধিক, কাহারও উৎসাহ অধিক, কাহারও বৈরাগ্য অধিক, কাহারও হিতানুষ্ঠান অধিক। এ সকল বিভিন্নতা ও তারতম্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

"ঈশ্বর প্রসাদে যে ভাই যে গুণ সমধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছেন তাহা যে কেবল সত্যের অনুরোধে সকলের মানিতে হয় তাহা নহে, তাহাতে আমাদের পরিবারের সকলের আনন্দ হয়।

"যাঁহার অধিক আছে তিনি অন্যকে তাহা বিতরণ করিতে সুখ বোধ করেন; অপর সকলেও তাঁহাকে সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সমাদর করেন এবং তাঁহার গৌরবে আপনাদের গৌরব মনে করেন।

"সকলেরই পরস্পরের কাছে কিছু শিখিবার আছে, সকলেরই পক্ষে পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক। যাহাকে অতি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট দেখিতে তাহাকেও আমরা ঘৃণা করিতে পারি না, ছাড়িতে পারি না।

"কতকগুলি অঙ্গ একত্র করিলে যেমন একটী শরীর হয় এবং তাহারা যেমন সকলেই পরস্পরের সহায়, আমরা সেইরূপ এই পরিবারের অঙ্গ এবং ছোট বড় কাহাকেও আমরা অতিক্রম করিতে পারি না।

"এইরূপ সম্বন্ধ থাকাতে আমাদের মধ্যে কেহ অহঙ্কার করিতে পারেন না, কেহ অন্ধভাবে পরের অনুগত হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা বিনাশ করেন না, কেহ আপনাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য জানিয়া কৃত্রিম বিনয়ের পরিচয় দেন না। যেখানে সকলেই সহায় সেখানে অন্যকে ঘৃণা করা অসম্ভব।

"আমাদের মধ্যে যাঁহারা উপদেষ্টা ও আচার্য্য তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ও সেবা করি। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মোন্নতি জন্য এবং জগতে ধর্ম্মপ্রচার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

"তাঁহাদের আর অন্য কার্য্য নাই, অন্য চিন্তা নাই ; বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা নিয়ত ধর্ম্মপথে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। মন্দ পথে যাইতে দেখিলে তাঁহারা ধর্ম্ম পিতা হইয়া স্নেহের সহিত আমাদিগকে নানা উপায়ে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, এবং যতক্ষণ না ভাল হই ততক্ষণ ছাড়েন না। আমাদের উন্নতির জন্য তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত এবং তাঁহারই আদেশে ও সাহায্যে তাঁহারা দিন রাত্রি আমাদের উপকার করেন।

"আমরা তাঁহাদের নিকট মহোপকার পাইয়া এবং তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া সকৃতজ্ঞ

হৃদয়ে তাঁহাদের সেবা করি। তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত বা নিষ্পাপ মনে করি না। তাঁহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহাও বিশ্বাস করি না। তাঁহারা নিজ গুণে আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন ইহাও আমরা মানি না। তবে তাঁহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন সহায় ও নেতা। ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে প্রগাঢ় স্নেহ ও মমতার সহিত তাঁহারা আমাদের হিত সাধন করেন, এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়াও আমাদের সুখ বর্দ্ধন করেন।

"তাঁহারা যে কেবল আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন তাহা নহে; প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবনের উন্নতি সাধন করেন। দুঃখ বিপদের সময়ে তাঁহাদেরই নিকট আমরা শান্তি লাভ করি, তাঁহাদেরই মুখে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ঈশ্বর প্রেমের কথা শুনিয়া প্রাণকে শীতল করি। এমন ধর্ম্মবন্ধুদিগকে যথোচিতরূপে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উপহার দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"দাস দাসীদিগকে আমরা নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না, তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারি না। যাহাতে তাহাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয় তজ্জন্য আমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে হয়।

তাহাদিগকে অযত্ন করা, রোগ বা বিপদের সময় অবহেলা করা এখানে নিষিদ্ধ।

"ভৃত্যদিগকে ভাল বাসিতে ও তাহাদের হিত সাধন করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বদা আদেশ করেন। তিনি বলিয়াছেন তাহারা যেমন আমাদের সেবা করে আমরাও তাহাদের সেবা করিব।

"পশুপক্ষীদিগের প্রতিও আমরা নির্দ্দয় হইতে পারি না। ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতম কীটও আমাদের দয়ার পাত্র। উহাদিগকে দেখিলে যেমন মন প্রাণ প্রফুল্ল হয় তেমনি আবার উহাদের মধ্যে সেই সর্ব্বস্রষ্টার বিচিত্র কৌশল ও অপার দয়া উপলব্ধি করিয়া আত্মা পবিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

"আমাদের বাগানে বৃক্ষ লতা ফল ফুলও আমাদের কত উপকার করে। উহারা ঈশ্বর হস্ত রচিত, এবং সর্ব্বদা তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিতেছে।

"ধন্য জগদীশ্বর! প্রেম-সিন্ধু ধন্য! এমন সুখের নিকেতনে আমাদিগকে রাখিয়াছ। কবে সকল নরনারী এখানে আসিয়া প্রাণ জুড়াইবে? কবে সমুদয় জগৎ স্বর্গ তুল্য হইবে?"



কলুটোলার বাটীতে অধিবাস কাল।

সেনবংশের কলুটোলার বাটী তখন একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের একটী মহাদুর্গ স্বরূপ ছিল। তখন কর্ত্তা দেওয়ান হরিমোহন সেন, পিতৃব্য মুরলীধর সেন, জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র সেন; সকলেই সন্তান সন্ততি লইয়া বহু পরিবার একত্র একঅন্নে বাস করিতেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী যদিও তখন যুবা, তিনিও এই একান্নভুক্ত।

কেশবচন্দ্রকেও মহর্ষির বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই বাটীতে বাস করিতে হইল। পিরালী ঠাকুর বাড়ীতে গিয়া বাস করাতে তাঁহার জাতি গিয়াছিল, তাই তাঁহার নিজ ঘরেই প্রথম প্রথম তাঁহার এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের আহার সামগ্রী দেওয়া হইত। তাহার পর তাঁহাদের কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়।

এইখানে বলা আবশ্যক কলুটোলার বাটীতেই ব্রহ্মানন্দের এক একটী করিয়া তিন কন্যা ও চারিটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই ছেলে-মেয়েগুলির লালন পালন করিতে এখানে সতী জগন্মোহিনী দেবীকে যে কি বিষম কষ্টভোগই করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। জন্ম-বৈরাগী স্বামীর অনুগমনার্থ তিনি যদিও কোন কষ্টকেই

কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই, তথাপি যখনই জীবনের কষ্ট যন্ত্রণার কথা মনে করিতেন, তখন তাঁহার কলুটোলার বাড়ীর কষ্টের কথাই সর্ব্বপেক্ষা অধিক মনে হইত।

ব্রহ্মানন্দ তো বহির্বাটীতে থাকিয়া এই মহাহিন্দুকেল্লার মধ্যেই আপন ধর্ম্মসঙ্গী ও সহচরদের লইয়া মহোল্লাসে এবং নিত্য নিত্য নব নব ধর্ম্মোৎসাহকর ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া জীবনে নব ধর্ম্ম বিকশিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্দর মহলে অর্দ্ধশিক্ষিতা, কুসংস্কারাপন্না নারীগণের মধ্যে পড়িয়া কি কষ্টকর অবস্থাতেই যে দেবী জগন্মোহিনীকে দিন কাটাইতে হইত, তাহা তিনিই জানেন।

বাটীর সকল নারীই এক ধর্ম্মাবলম্বী এক ভাবের ভাবুক, আর একা তিনিই অন্যভাবাপন্না। অপর সকলেই এক জাতীয়, কেবল তাঁহাদের জাতি নাই। কেমন যেন একটা বিদ্বেষ বিরুদ্ধ ভাবে, কেমন হয়ত একটা ছুঁই ছুঁই ভাবে ঘৃণার চক্ষে সকলেই তাঁহাদের প্রতি দেখিতেন। বাড়ীতে কোন কাজ কর্ম্ম হইলে সকলেই একত্র আহার করেন, কিন্তু তাঁর ও তাঁহার ছেলে-মেয়েদের আহারের স্থান স্বতন্ত্র। ইহাতেই বেশ বুঝা যাইবে কি দীন ভাবেই তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের

থাকিতে হইত। বিশেষতঃ অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের নিকটেও তাঁহার সন্তান-সন্ততিদের পর্য্যন্ত অতি হীন ভাবে থাকিতে হয়, ইহা দেখিলে মার প্রাণে যে গভীর আঘাত লাগিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি।

এখানে অবশ্যই বলা আবশ্যক কেশব-জননী মা সারদা দেবী কিন্তু কখনই তাঁহাদিগকে অন্যভাবে দেখিতেন না। এবং কেবল কেশব-পরিবার কেন কেশবের দলস্থ জাতীবিহীন অতি সামান্য লোককেও মা সারদা দেবীর অলৌকিক স্বর্গীয় স্নেহ কখনও অন্য পর ভাবিতে জানিত না।

যাহাহউক এই পরিবারস্থ অপর মহিলাগণের নিকট কেশব-পরিবার কিরূপ ব্যবহার পাইতেন তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। এক দিন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকল ছেলেমেয়েরা একত্র খেলা ধুলা করিতেছিল, এমন সময়ে ছেলেদের খাবার জায়গা হইল। ছেলেদের খাইতে ডাকিলে অন্যান্য ছেলেরা কেশবচন্দ্রের ছেলে-মেয়েদেরও ডাকিয়া কাছে বসাইল, ইহা দেখিয়া বাড়ীর একজন গিন্নী কেশব-পুত্রকন্যাদের সেখান হইতে উঠাইয়া স্বতন্ত্র এক স্থানে বসাইয়া দিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ইহাতে এতই প্রাণে আঘাত অনুভব করিলেন, যে

সেখান হইতে উঠিয়া আপনাদের ঘরে গিয়া সে মার কাছে কেবল কাঁদিতে লাগিলেনই, এমন কি তাঁহাকে সকলে বারম্বার জিদ করিলেও তিনি কিছুতেই সেখানে আহার করিতে গেলেন না। শুনা যায় তাহার পর হইতে আর নাকি তিনি কখনই অন্য ছেলেদের সহিত একত্র আহার করিতে যাইতেন না।

বাটীর অন্যান্য ছেলেরা গাড়ী করিয়া স্কুলে যাইতেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্রকে অনেক দিনই পদব্রজে বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। এইরূপ একত্রে থাকিলেও সতীর পুত্র কন্যাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। এমন কি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যেরাও বাটীর কর্ত্তাদিগের ছেলেদের সহিত ইহাঁদের যথেষ্টই ইতর বিশেষ ব্যবহার করিত। এই কলুটোলার বাটীতে অবস্থান করিতে করিতেই ব্রহ্মানন্দ বিলাত যাত্রা করেন। তিনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহাদের পৃথকান্নের ব্যবস্থা হয়। এখন আরো তাঁহারা জাতিচ্যুত বলিয়া অনেক সময় কোন চাকর বা ব্রাহ্মণ পাওয়াই যাইত না। সুতরাং অধিকাংশ দিন সতীকেই রন্ধনাদি করিতে হইত।

তখন হইতেই শ্রদ্ধেয় প্রেরিত-অভিভাবক শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় কেশবচন্দ্রের পারিবারিক ভরণ

পোষণের বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীকেশবের পুত্র-কন্যাগণও তাঁহাকে "কাকা বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ছেলেদের কোন কিছু আবশ্যক হইলে সতীও "কাকাবাবুকেই" বলিতে বলিতেন।

যাহাহউক সতী জগন্মোহিনী দেবীকে পুত্র-কন্যাদের লইয়া কলুটোলার বাটীতে অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পরিজনবর্গের কাহাকে আপন কষ্ট দুঃখের বিষয় কখনই জানিতে দিতেন না, এবং সকলে তাঁহাকে প্রফুল্ল বদনেই দেখিতেন। কেবল যে মনের দুঃখ নিতান্ত অসহ্য হইত গোপনে স্বামীকে জানাইতেন; তিনিও কখনও বা শুনিতেন, হুঁ, হাঁ করিতেন, কখনও বা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, "ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই তুষ্ট হইয়া সহ্য করিতে হইবে" ইহাই উপদেশ দিতেন। অধিকাংশ দিনই ব্রহ্মানন্দ বহির্বাটীতে বন্ধুবর্গের সহিত এত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইতেন যে সতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎই হইত না এবং তাঁহার মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইত। কাজেই পরিজনবর্গের নির্য্যাতনে যে স্বামীর নিকট সহানুভূতি পাইবেন তাহারও বড় একটা উপায় ছিল না।

অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত বসিয়াও যে সতী দুই এক দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিয়া মনের ভার কমাইবেন, তাহারও সুযোগ হইত না। তবে কখনও কোন ব্রাহ্মিকা বন্ধু বাটীতে আসিলে তাঁহারই সহিত যাহা কিছু কথাবার্ত্তা কহিতে পাইতেন। ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে প্রেরিত-প্রচারক শ্রদ্ধেয় উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নীর সহিত নাকি প্রথম ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ পরিচয় হয় এবং তিনিই মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার এ সময়ের অনেকটা সঙ্গিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় একদিন নয় দুইদিন নয় বহু বৎসর ধরিয়া কলুটোলার বাটীতে সতী জগন্মোহিনীকে বাস করিতে হইয়াছিল। নারীকুলের দুঃখ দুরবস্থার সহানুভূতি করিতে কি না তিনি প্রেরিত, তাই ধনমান সম্পন্ন পরিবারের বধূ হইলেও এই দুঃখ দুরবস্থার পেষণে ভগবান তাঁহাকে সংসারের ক্লেশ বহনে বিশেষ সক্ষম করেন এবং ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা যথেষ্টই শিক্ষা দান করেন।

এই কলুটোলার বাটীতে অবস্থানকালের কিছু কিছু ঘটনাবলী বা সতীর জীবনের আখ্যায়িকা যাহা তাঁহার পরিবারস্থ কোন সাধ্বী মহিলার নিকট হইতে সংগ্রহ

করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণিত হইবে এই ভাবিয়া আমরা এই খানেই তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম। সাধ্বীদেবী বলেন ঃ—

"দেবী জগন্মোহিনীর জীবনে যে কত পরীক্ষার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সংসারের দুঃখ কষ্ট কত যে সহিতে হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর লোকে কেহ জানিবে না। বিকসিত পুষ্প যেরূপ কণ্টক বৃক্ষে থাকিয়া চিরদিন সৌন্দর্য্য ও সৌরভই বিকাশ করে, সতীর সেই স্বর্গীয় জীবন, পৃথিবীর দুঃখ যাতনা তুচ্ছ করিয়া, সহাস্য মুখে সেইরূপ সংসারে বিচরণ করিয়াছে।

"যখন প্রধানাচার্য্যের গৃহ হইতে কলুটোলার বাড়ীতে দেবী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন হইতে জাতিচ্যুত বলিয়া আত্মীয়া, বন্ধু, স্বজন সকলেই যেন একটা ঘৃণার ভাব দেখাইল। সে ভাব সন্তানসন্ততি হইবার পরও সতী জগন্মোহিনীর উপর প্রবল ছিল। কলুটোলার বৃহৎ বাড়ীতে অনেক পরিবার; সে গৃহে দাস দাসীও সকলের বহুসংখ্যক ছিল। কিন্তু আচার্য্যদেবের সংসার জাতিচ্যুত, ইহা ভাবে, কথায়, কার্য্যে, দাসদাসীগণও দেখাইত। পাচক ব্রাহ্মণও কত দিন পাওয়া যাইত না। দেবীকে নিজে রন্ধন করিতে হইত।

"এক সময় পাচক ছিল না, জগন্মোহিনী পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রন্ধন শেষ করিয়া কয়লার উনুনে জল ঢালিয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাতে সমস্ত উত্তাপ আসিয়া লাগাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তখন দেবীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া ঔষধাদি দিয়া তাঁহাকে কোন রকমে ভাল করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, আর সকলেরই দাস দাসী ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ভয়েই হউক আর যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ না আসিলে কেহ অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়াও প্রায় সাহায্য করিত না। একদা এক আত্মীয়ার দাসী দেবীর পানীয় জলের ঘটী পর্য্যন্ত পা দিয়া ঠেলিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়াছিল।

"একে দাস দাসী ও লোকজনের অভাবে কষ্ট, আবার তাহার উপর অর্থাদিরও স্বচ্ছলতা ছিল না। প্রথম প্রথম কলুটোলার বাটীর পরিবারস্থ সকলেই একান্নবর্ত্তী এক পরিবার ছিলেন, এক সঙ্গেই সবার আহার হইত, বাটীর কর্ত্তা যিনি, তিনি কেবল আচার্য্যদেবের হাতখরচের জন্য কিছু কিছু দিতেন, তাহাতে ত অর্থকষ্টের অবধি ছিল না; তাহার পর সকলে পৃথকান্ন হইলে এবং ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার পাইলে কিছু অর্থের স্বচ্ছলতা হয়, কিন্তু তখনও যাঁহার হাতে সংসারের

ব্যয়াদি চালাইবার ভার ছিল, তিনি ভাণ্ডারে এক মাসের জন্য দ্রব্যাদি আনিতেন, এবং কএকটীমাত্র টাকা জল-খাবার প্রভৃতির জন্য দিতেন। ইহার ভিতর হইতেই সতীর সমস্ত সংসারের অভাব মোচন করিবার ভার; পুত্র কন্যার বস্ত্রাদি গাড়ীভাড়া প্রভৃতি সকল খরচ দিতে হইত। কন্যারা বড় হইয়া উঠিল, তথাপি কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় টাকা বৃদ্ধিও করেন নাই এবং বস্ত্রাদিও প্রায় কখনও ক্রয় করিয়া দেন নাই। বাড়ীতে অন্য বালিকাদল কত সাজ সজ্জা করিত, কত স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইত, দেবীর কন্যাদের কোথাও নিমন্ত্রণও হইত না, আর কখনও ভাল বস্ত্রাদিও হইত না।

"সন্তানদিগের এইরূপ খাইবার পরিবার কষ্ট দেখিয়া মাতার হৃদয়ে যে কত কষ্ট হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কন্যারা কিছু চাহিলে তাহা দিতে না পারিলে কি তাঁর স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে গভীর শেল বিদ্ধ হয় নাই? এই সময়ে ব্রাহ্ম সাধক সাধিকাদিগের একত্র অধিবাসে "সুখী পরিবার" সাধনের নিমিত্ত "ভারতাশ্রম" স্থাপন হয়। এই "ভারতাশ্রম" প্রভৃতিতে কত ব্যয় হইত, আশ্রমের মহিলাদের সাজ সজ্জাও আচার্য্যদেবের কন্যাদিগের অপেক্ষা ভাল ছিল। অন্যান্য বিলাত প্রত্যাগত বা

অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মদিগের সাজ সজ্জার ত কথাই নাই। কোন পার্টি বা সম্মিলন হইলে সকল মহিলাই অতি সুসজ্জিত বেশে যাইতেন, কেবল আচার্য্যপত্নী এবং কন্যাগণের বেশভূষা সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য রকমেরই হইত। বালিকা কন্যাগণ অবশ্যই তেমন হীনবেশে সে প্রকার সাজসজ্জা-সম্পন্ন মহিলাসমাজে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন, কিন্তু পতিব্রতা সতী এক স্বামীর খাতিরেই সেই সামান্য বেশেও অকুণ্ঠিত চিত্তে যাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার শোভা সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্ব অধিকতররূপে প্রকাশ পাইত।"

আমাদের মনে হয় গরিবের বন্ধু ব্রহ্মানন্দ ধনী দরিদ্র সকল মহিলাই অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই সব পার্টিতে যাহাতে সমবেত হইতে পারেন তাহারই সংদৃষ্টান্ত স্থাপন জন্যই সম্ভবতঃ আপন স্ত্রী ও কন্যাদের যে সামান্য বেশভূষা থাকিত সেই সামান্য, অথচ অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে, অবাধে যাইতে দিতেন। সতীর জ্যেষ্ঠা কন্যা Native Ladies Normal স্কুলে যখন পাঠ করিতেন তখনও তাঁহাকে অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা হীনবেশে যাইতে হইত এবং অনেক সময় একটীর বেশী সেমিজ না থাকাতে ভিজে সেমিজ গায়ে দিয়াও যাইতে হইত।

"এক সময়ে, দেবীর কর্ণ ছিদ্র করিয়া গহনা পরিবার কারণে সমস্ত কর্ণ ফুলিয়া দারুণ ব্যথা হয়, সেই সময়ে এক (আত্মীয়) শিশু কিসের জন্য কর্ণে ভয়ানক আঘাত করে, সেই আঘাতে দরদর ধারে রুধিরধারা বহিতেছে দেখিয়া কোন আত্মীয়া সেই শিশুকে তিরস্কার করেন। শিশুর মাতা সেই তিরস্কার শুনিয়া বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া শিশুকে কতই প্রহার করিলেন। কারণ দেবীর জন্য তাঁহার শিশুকে কেহ কিছু বলিবে কেন, এই বলিয়া আপন শিশুকে প্রহার করিয়া রাগ জানাইলেন। সেই প্রহারের কথা শুনিয়া দেবী অত্যন্তই সঙ্কুচিত, এবং এত অপ্রতিভ হইলেন যে মনে করিলেন নিজে যেন কি অপরাধ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহব্যবহার মিষ্ট কথায় সমবয়স্কারা বশীভূত হইয়াছিল। বৃদ্ধারাও সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তবে কেহ কেহ আপনাদের স্বভাব বশতঃ যেমন সাধারণ জ্ঞাতি হিংসা করে সেইরূপ করিত।

"দেবীর এত লজ্জা ছিল যে, কাহারও সম্মুখে আচার্য্যদেবের সঙ্গে কথা বলিতেন না। আচার্য্যদেব যখন আহার করিতে বসিতেন তখন দেবী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কোণে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। আচার্য্যদেবের

আহারের পূর্ব্বে, কি সুস্থ কি অসুস্থ অবস্থায় কখনও দেবী আহার করেন নাই। আচার্য্যদেবের স্বাস্থ্যের জন্য সদাই চিন্তিত ও ব্যাকুল-চিত্ত থাকিতেন। শত সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকা বশতঃ আচার্য্যদেব কখনও সময় মত আহার নিদ্রা করিতে পারেন নাই, সেইজন্য দেবী সর্ব্বদাই কেমন চিন্তিত থাকিতেন। আচার্য্যদেবের দেহের শত্রুও এ পৃথিবীতে অনেক ছিল, ইহা সতী জগন্মোহিনী বিশেষরূপে জানিতেন। কোন কার্য্য শেষ করিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিলে ভাবিতেন হয়ত কেহ পথে মারিয়া ফেলিয়াছে।

"কলুটোলার বাটী হইতেই আচার্য্যদেব ১৮৭০ সালে বিলাতযাত্রা করেন। বিলাতে যখন তাঁহার পীড়া হয়, তারে সেই সংবাদ পাইয়া দেবী যারপর নাই অস্থির হইয়া পড়েন, সুস্থ সংবাদ আসিলে তবে সুস্থির হন।

"দেবীর লজ্জাশীলতার আর একটী পরিচয় দিতেছি। একবার আচার্য্যদেব ১১ই মাঘের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে দেবীকে লইয়া যাইবেন এইরূপ স্থির করেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তখন অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, আচার্য্য-দেবের মাতার গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দেবী ভাবিলেন কি জানি শ্বশ্রূঠাকুরাণী যদি দেখিতে পান, সেই নিমিত্ত দেবী প্রদীপটী সরাইয়া রাখিতে কহিলেন। আচার্য্যদেব

প্রদীপ সরাইলে তবে তিনি স্বামী সঙ্গে বাটীর বহিঃ-প্রাঙ্গণে গেলেন। দেবী পাল্কীতে উঠিলে আচার্য্যদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সেইদিনই উৎসবের পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আর একবার সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও সতী এইরূপে গমন করেন।

"দেবী জগন্মোহিনীর কিছু অধিক লজ্জাশীলতা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং তেজস্বিতাও কম ছিল না। কলুটোলার বাড়ীতে বা অন্য কোন হিন্দুপরিবারে নিমন্ত্রিত হইলে কুসংস্কারাপন্ন, হিন্দুমহিলাগণ তাঁহাকে কত রকম প্রশ্নই ধৃষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিত, ইহাতে তিনি কখনই লোকভয়ে কোন প্রকার সত্য গোপন করিতেন না, অসঙ্কুচিতচিত্তে যাহা সত্য তাহাই বলিতেন।

"দেবীর গুরুজনভক্তি আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি আচার্য্যমাতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে ঐকান্তিক ভক্তি করিতেন এবং কিছুদিন নিয়মিতভাবে ব্রত লইয়া তাঁহার পদ পূজা করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন। দেবীর মাতৃভক্তি-ভাবও সকলের পূজ্য। মাতার প্রতি কি অচলা ভক্তিই ছিল। মাতার সেবার জন্য তাঁহার প্রাণ সদাই ব্যস্ত

থাকিত। পিত্রালয়ে তেমন অর্থাদি ছিল না, সদা সর্ব্বদা যে রকমে হউক পিতা মাতা ও ভাই ভগিনীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দিয়া সেবা করিতেন।

"কলুটোলার বাড়ীতে নিত্য উৎসবাদি হইত। সকল বিষয়েই দেবী যোগদান করিতেন। কোলের শিশুসন্তান ফেলিয়া, সংসারের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়াও মন্দিরে প্রতি রবিবারে নিয়ম করিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। কলুটোলার ত্রিতল গৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনায় পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতেন। এজন্য কেহ "খৃষ্টান," কেহ "পিরালীর" মত, "কেহ জাতি নাই" বলিয়া কতই বিদ্রূপ উপহাস করিত। তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না এবং আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কখনই ভুলিতেন না।

"সতী প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আপন ছেলে মেয়েদের লইয়া নিয়মিতরূপে প্রার্থনাদি করিতেন এবং আপনিই তাহাদের পাঠ বলিয়া দিতেন।

"একদা দেবী বালিতে পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাদ্বারা আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন। কন্যা গিয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, মা বালি যাবেন, কে সব ঠিক করিয়া দিবেন?"

কেশব হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত নামই ব'লে দিলি, সে সব ঠিক করবে।" কন্যা না বুঝিয়া আবার বলিলেন, "কে সব ঠিক কর্‌বে বল।" তুই চারিবার বলিবার পর কন্যা বাবার ভাব বুঝিতে পারিয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা বলিলেন। তখন অনেক আত্মীয়া মহিলারা সে স্থানে উপস্থিত, সেখানে একটা মহা হাসির রোল উঠিল।

"অনেক সময়ে আত্মীয়েরা দেবীকে গহনা কিনিবার কি তৈয়ার করাইবার জন্য বলিতেন। একবার ফর্দ্দ করিয়া গহনার জন্য আচার্য্যদেবকে পাঠাইয়া দেন। চন্দ্রহারের স্থানে আচার্য্যদেব লিখিয়া দিয়াছিলেন যে "কেশব-চন্দ্র-হার" পরিয়াছ, আবার চন্দ্রহার কি?" সংসারে ধর্ম্মের মিলন এমন আর কোন্‌ জীবনে দেখা যায়?"

সতী জগন্মোহিনী দেবী কিরূপ লজ্জাশীলা ছিলেন তাহা তাঁর সঙ্গিনী এবং যৌবন-বন্ধু নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্নীর নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। এই প্রচারকপত্নীদেবী বলেন ঃ—"যখন মিস কার্পেণ্টার প্রথম কলিকাতায় আসেন, তখন ডাক্তার গুডিভ

চক্রবর্ত্তীর বাসভবনে একটী ইভিনিং পার্টি হয়, এবং সেই পার্টিতেই ব্রাহ্মিকাগণ প্রথম উপস্থিত হ'ন। আমরা তখন চাঁপাতলায় একটী ভাড়া বাড়ীতে থাকিতাম। আচার্য্যদেব উৎসাহের সহিত আমাদের সকলকে লইয়া একখানি গাড়ীতে তুলিলেন। তিনি অন্যের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন, যে নিজের পত্নীকে গাড়ীতে আনিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নী একাকিনী সেই ভাড়া বাড়ীতে কেহ নাই দেখিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। তখন আমার ১০।১২ বৎসরের একটী ভ্রাতা তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ইনি কে? কোন স্বর্গের দেবী নাকি? এমন রূপ ও মুখের জ্যোতি ত কখন দেখি নাই! অনেক অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা ছিলেন। আমার ভ্রাতা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল "আপনি কি লক্ষ্মীঠাকরুণ? আপনি কেন কাঁদিতেছেন? আপনার কোন ভয় নাই। আমি ও একজন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ এই বাড়ীতে আছি। আপনার কি প্রয়োজন আমাকে বলুন, আমি তখনি করিব।" তখনি আচার্য্যপত্নী আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—"আমাকে তিনি লইয়া যান নাই, ফেলিয়া গিয়াছেন।" তখনও গাড়ী অধিক দূর যায় নাই, আমার ভ্রাতা পাচককে

সেই গাড়ী ফিরাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিল। সে অমনি দৌড়িয়া গাড়ীর নিকটে গেল এবং একখানি গাড়ী ফিরাইয়া আনিয়া আচার্য্যপত্নীকে উঠাইয়া দিল। পরে সকল গাড়ী একত্র হইয়া ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাওয়া হইল। সেখানে অনেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও কয়েক জন সাহেব মেমও ছিলেন। ডাক্তারের একটী কন্যা সেদিন পিয়ানো বাজাইয়া গান করিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর আলাপ করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন।"

আধুনিক সাধারণ ব্রাহ্মের ন্যায় পত্নীকে জোর-জবরদস্তি করিয়া সংস্কার করা বা স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া ব্রহ্মানন্দের অভিমত ছিল না। স্বইচ্ছায় স্বীয় প্রকৃতি সঙ্গত লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া স্ত্রীকে নিজ স্বাধীনভাবে উন্নতি সাধন করিতে দিতেই তিনি ভাল বাসিতেন এবং বাহ্যিক স্বাধীনতা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক স্বাধীনতারই তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ এই বাহ্যিক স্বাধীনতা তো প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা নয় অনেকটা স্বামীরই স্বেচ্ছাধীনতা। একবার কোন ব্রাহ্মের অসবর্ণ বিবাহ উপলক্ষে সতী জগন্মোহিনী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া

সেখানে আহার করেন নাই। তখন প্রায়ই এইরূপ ভাব তাঁহার ব্যবহারে দেখা যাইত। এজন্য শুনিতে পাই কোন প্রচারক মহাশয়ও ব্রহ্মানন্দের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাঁহার উত্তরে মুচ্‌কি হাসিয়া বলেন "জোর করে ধরে ধর্ম্ম কি হয়? আস্তে আস্তে আপনাপনি সবই হবে, স্বাভাবিক উন্নতিই উন্নতি।" নববিধান প্রচারের পর সতীর জীবনে এই সত্যের প্রমাণ যথেষ্টই হইয়াছিল।





শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

[যৌবনে।]

প্রবাসে স্বামীদেব সঙ্গে ভ্রমণ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ হয় স্বাস্থ্যোন্নতি নয় সাধনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে প্রবাসে যাইতেন। এই সময়ে স্ত্রী-সন্তানদেরও প্রায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কেবল শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত যখন তিনি সিংহল যাত্রা করেন, বা যখন বিলাতে গমন করেন কিম্বা সদলে প্রচার যাত্রায় যান তদ্ভিন্ন আর যে যে স্থানে যখনই গিয়াছেন তখনই প্রায় স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে লইয়া গমন করিয়াছেন। সস্ত্রীক সপরিবারে সাধনই তাঁর ধর্ম্মসাধনের বিশেষ লক্ষণ, তাই বিশেষ বিশেষ ভাবে দুই একবার বৈরাগ্য সাধন করিতে বা ধর্ম্মপ্রচার করিতে যখন যান, তদ্ভিন্ন স্ত্রী-সন্তানদের ত্যাগ করিয়া তিনি কখনই থাকিতেন না বা কোথাও যাইতেন না।

এইরূপে তিনি শিবপুর, রাণীগঞ্জ, মসুরী, নৈনীতাল, দার্জ্জিলিঙ্, জলপাইগুড়ী, গাজীপুর, লাহোর, দিল্লি, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, সিমলা প্রভৃতি স্থানে সময়ে সময়ে গিয়া কখনও দুইমাস, চারিমাস, ছয়মাস করিয়া বাস করিয়া সাধন ভজন প্রচারাদি করেন।

এই সকল সময়েই সতী জগন্মোহিনী দেবী হিন্দু-পরিবারস্থ অবরোধ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া কতকটা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিতেন এবং স্বাধীনভাবে স্বামীসঙ্গ সহবাসে ধর্ম্মসাধনাদি করিয়া যথেষ্ট আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি লাভ করিতেন।

সতী জগন্মোহিনী দেবীর এই স্বামী সঙ্গে প্রবাস সাধন সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা আমরা এইখানে প্রদান করিলাম। ইহাতেও তাঁহার প্রকৃতিগত দেব চরিত্রের অনেক আভাস পাওয়া যাইবে।

কোন সময়ে শিবপুরে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাড়ীতে আচার্য্যদেব ও কোন কোন প্রচারক সপত্নীক গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মিকা এমন সাজসজ্জা করিয়া গিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণধন বাবুর মাতা কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া পড়েন। বৃদ্ধা হিন্দু বিধবা, দেশীয় আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবতী; কৃষ্ণধন বাবু যে ধর্ম্ম লইয়াছেন সেই ধর্ম্মাবলম্বী মহিলারা এইরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করেন দেখিয়া বৃদ্ধা চমকিতা ও শঙ্কিতা হন। এবং মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন "কৃষ্ণধনের গুরু-শিষ্যাণী যদি এইরূপ পোষাক পরেন, না জানি গুরুপত্নী বা কি অদ্ভুত পোষাক পরিচ্ছদে আসেন।" দেবী জগন্মোহিনী

ইহার পূর্ব্বে বালি গিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতেই তিনি এই কৃষ্ণধন বাবুর বাড়ী গমন করেন। তাই তিনি সকলের শেষে আসিয়া পঁহুছিলেন। যখন তিনি পাল্কী হইতে নামিলেন, তাঁহার রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃষ্ণধন বাবুর মাতা একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন এবং কতই আদর করিলেন। দেবীর পরিধানে লাল পাড়ের সাড়ী, কপালে মস্তকে সিন্দুর শোভিত; বৃদ্ধা ইহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ। দেবীর রূপ স্বভাব দেখিয়া তখন কৃষ্ণধন বাবুর মাতা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন "আহা! কৃষ্ণধনের গুরুপত্নী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

আচার্য্যদেব সপরিবারে যখনই পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, দেবী সতীত্ব প্রভাবে ও স্নেহার্দ্র হৃদয়ে সকলকেই মুগ্ধ করিতেন। যখনই দেবীকে যে সকল নারী দেখিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহারা ভক্তি, প্রীতি, সেবা-দানে সুখী হইয়াছেন। দেবীর মুখের কথা শুনিতে ও হাসি দেখিতে কত নারীই ভাল বাসিতেন। একদা মহর্ষিদেবের কন্যারা আসিয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম-নন্দিনী, একবার সেই রকম হাস দেখি, তোমার সেই হাসি বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে"।

যখন আচার্য্যদেব নৈনীতাল পর্ব্বতে যান, দেবীর সঙ্গে একাসনে যুগল সাধনের ছবি তুলিয়াছিলেন। এই যুগলরূপে, দেবীর পরিধানে বারাণসী বস্ত্র, সঙ্গে একটী জলের ঘটী ও ফুল। আচার্য্যদেবের পরিধানে গেরুয়া, সঙ্গে কমণ্ডলু, বাঘছাল, ও একতারা। এইটি "হরগৌরীর" ভাব। এই নৈনীতালে অবস্থানকালেই সতী জগন্মোহিনী দেবী প্রথম আচার্য্যদেবের প্রার্থনা লিখিতে আরম্ভ করেন; তারপর তিনি মোহিনী দেবীকে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই মোহিনী দেবীই পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা বধূ হন। যাহাহউক সতীর উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই আচার্য্যদেবের অমূল্য প্রার্থনা সকল কতক রক্ষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারই দৃষ্টান্তে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা এবং মধ্যমা কন্যা এই প্রার্থনা সকল লিখিয়া রাখেন।

এক সময় দেবী ছোট ছোট সন্তানগুলিকে লইয়া ষ্টীমারে করিয়া শারদীয় উৎসবে যাত্রা করেন। সেই ষ্টীমারে আচার্য্যদেব দেবীর সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "এই যে পূর্ণচন্দ্র আকাশে দেখিতেছ, যেন ঘুলঘুলি দিয়া ভগবান্ উঁকি মারিতেছেন। চন্দ্রটী ঘুল্‌ঘুলি স্বরূপ।" প্রতি বৎসরই প্রায় পূজার সময় এইরূপ সতী স্বামী সঙ্গে দেশ ভ্রমণে

যাইতেন। একবার অতি দুগ্ধপোষ্য কোলের শিশুকে লইয়াও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ষ্টীমারে বেড়াইয়া আসেন। ব্রহ্মানন্দ যেখানে যখন লইয়া যাইতে চাহিতেন বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, শত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতেন।

সতী জগন্মোহিনী যখন শেষবার দেবস্বামী সহ সিমলা শৈলে গমন করেন, তখন তাঁহার জীবনের প্রতিভা যথেষ্ট সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। অর্থের অনটন, আচার্য্য-দেবের দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও পীড়িত, অন্যান্য নানা-রূপ পরীক্ষা, কিন্তু সেই সময় সতীর মুখে যোগের ভাব যে কি সৌন্দর্য্যই ঢালিয়া দিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এ কাহিনী পরে বলিব। যাহাহউক পতির অনু-গমনই যে সতীর জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং মহা পুণ্যব্রত, দেবী ব্রহ্মনন্দিনী কি গৃহে কি বাহিরে ইহারই নিয়ত পরিচয় দিয়াছেন।



"কমল কুটীর" স্থাপন ও তথায় অধিবাস।

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল ততই ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম নব নব রূপে বিকাশ পাইতে লাগিল। নদী যেমন পর্ব্বত-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে প্রসারিত হয় এবং সাগরসঙ্গমে মিলনের পূর্ব্বে বহুধারায় প্রবাহিত হয়, সেইরূপ কত কত প্রণালী, কত কত অনুষ্ঠান, কত কত প্রচার ব্যবস্থা ও আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ আপন "ধর্ম্ম-বিধান" প্রচারের ও প্রসারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কলুটোলার বাটীতে অবস্থান করিতে করিতেই সাধনের জন্য "সাধন কানন", যুবাদের জন্য "নিকেতন," ব্রাহ্ম সাধক সাধিকাদের এক-পরিবার-ভাবে একত্র বাসের জন্য "ভারত-আশ্রম" ; এতদ্ব্যতীত "প্রচারাশ্রম", "ভারত সংস্কারক সভা" ইত্যাদি কত কত উপায়েই তিনি ধর্ম্ম প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। সতী জগন্মোহিনী দেবীর উৎসাহ এবং ঐকান্তিক যোগ যে ব্রহ্মানন্দের এই সকল অনুষ্ঠানে যথেষ্ট সহায় হয় বলা বাহুল্য। ব্রহ্মানন্দ বিশেষ ভাবে যেমন পুরুষদিগের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের মধ্যে

কার্য্য করেন, সতী জগন্মোহিনীও নারীদিগের প্রতিনিধি-রূপে কার্য্য করিয়া স্বামীর সহকারিতা করেন।

ক্রমে শ্রীকেশবের নিত্য নবোন্নতি-বিকাশিনী প্রাণ আর যেন কলুটোলার হিন্দু সংস্রবে আবদ্ধ থাকিতে এবং আপন পরিবারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তাই তিনি ইং ১৮৭৭ সালে কলুটোলার বাটীর নিজ অংশ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেনকে বিক্রয় করিয়া ৭২নং (এখন ৭৮নং) অপার সার্কুলার রোডে মিস্ পিগটের স্কুল বাড়ী ক্রয় করিলেন, এবং তাহাকে সংস্কার পূর্ব্বক ১২ই নবেম্বর আপন ধর্ম্মমতানুসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া "কমল কুটীর" নামে অভিহিত করিলেন। এই খানেই তখন হইতে সপরিবারে আপন বাসাশ্রম স্থাপন করিলেন।

যথা নিয়মিত উপাসনার পর নিম্ন প্রণালী অনুসারে গৃহ প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় পঠিত হয়।—"(১) এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (২) এই গৃহের কুঞ্জিকা ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৩) এই চাউল দাউল প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৪) এই পরিধেয় বস্ত্রাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৫)

এই শয্যা আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৬) এই তৈজসাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৭) এই পুস্তক কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (৮) এই ঔষধাদি আমি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিলাম। (৯) এই রজত ও তাম্রখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (১০) এই বাদ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনের উপকরণ আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম। (১১) সন্তানাদি পালন, দাসদাসী পালন, বিদ্যাধ্যয়ন, দীন ব্যক্তিকে দান, অতিথি সেবা, পালিত পশ্বাদি রক্ষা, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ধনোপার্জ্জন ও ব্যয় প্রভৃতি এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম গৃহকর্ত্তা যেন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সম্পন্ন করেন।"

এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৲ টাকা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ৮৲ টাকা ও দীন দুঃখীদিগকে ৪৲ টাকা প্রদত্ত হয়।

এই বাটীর পশ্চিম দিক দিয়া তখন উপরে উঠিবার সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ির উত্তর পার্শ্বস্থ বাটীর পশ্চিম দিকের একটী প্রকোষ্ঠে উপাসনা গৃহ স্থাপন করিয়া তাহাতেই নিত্য উপাসনা, সাধন ভজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। পরে তাঁহার স্বর্গারোহণের অষ্টাহ মাত্র পূর্ব্বে

বর্ত্তমান প্রশস্ত "নব-দেবালয়" ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বাটীর উত্তরাংশের ভূমিতে প্রচারক মহাশয়দিগের জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ উপযোগী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া "মঙ্গল বাড়ী" স্থাপন করেন। বাগানের মধ্যস্থ সরোবরকে "কমল সরোবর" নাম প্রদান করিয়া ইহার উত্তরাংশে একটী "সাধনকুটীর" স্থাপন করেন, এবং সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী গাছতলায় সদলে স্বহস্তে পাক করিয়া আহারাদি করিবার জন্য একটী ভোজনাগার নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীমান করুণাচন্দ্র, শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র, শ্রীমান প্রফুল্ল-চন্দ্র, শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী ও শ্রীমান সরলচন্দ্র এই সাতটী পুত্র ও কন্যা কলুটোলার বাটীতে হইবার পর সতী জগন্মোহিনী দেবীর পূর্ণ গর্ব্ভাবস্থায় কমলকুটীর কেনা হয়। এই সময়ে সকল আত্মীয়াগণই গৃহত্যাগ অর্থাৎ কলুটোলার বাটী ত্যাগ করিয়া দেবীকে যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি পতি আজ্ঞা শিরোভূষণ করিয়া কমলকুটীর প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশের কিছু পরেই দেবীর অষ্টম গর্ব্ভে শ্রীমতী মনিকা দেবীর

জন্ম হয়। তাহার পর এই কমলকুটীরেই শ্রীমতী সুজাতা দেবী ও কনিষ্ঠ শ্রীমান সুব্রতচন্দ্রের জন্ম হয়। এই গৃহে আসিয়া সতীকে কিরূপ অসুবিধার ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই কিছু কিছু বুঝা যাইবে।

একদা পাচক ব্রাহ্মণ আসে নাই, দেবী রন্ধন করিতে গেলেন। তখন একটী কন্যা শিশু কোলে। উপাসনার কিছু পরে তাহাকে উপরের একটী ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন, শিশুর কোমল কণ্ঠ শুকাইয়া যাওয়াতে সে চীৎকার আরম্ভ করিল, দূরতা বশতঃ সতী শিশুর ক্রন্দন কিছুই শুনিতে পান নাই, তখন বাহির হইতে কোন প্রচারক মহাশয় শুনিতে পাইয়া শিশুকে শান্ত করিয়া খবর দিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, দাস দাসীরও অভাব, সংসারের কাজ, সন্তান পালন ইত্যাদির জন্য তাঁহাকে যে এইরূপ কত কষ্টে থাকিতে হইত তাহা বলা যায় না।

অধিক শ্রমশীলতার অনভ্যাস হেতু দেবীর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে নিতান্ত কষ্ট হইলেও কখনও তাহাতে বিমুখ কি অসন্তুষ্ট হইতেন না। সংসারের কোন দাস দাসী না আসিলে কোন বিশৃঙ্খলা হইলে নিজেই সে অভাব মোচন করিতে যত্নবতী হইতেন। দূর বলিয়াই

কমলকুটীরে আসিয়া প্রথম প্রথম দাস দাসীদের বড়ই কষ্ট হইত।

কমলকুটীরে আসিবার পরও দেবীর জীবনে কতই পরীক্ষার ঝড় বহিয়াছিল। সংসারের আকাশ এক এক বার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর প্রতি অচল, অটল বিশ্বাস সে ঘোর আঁধার অল্পক্ষণেই দূর করিয়া দিত। কমলকুটীরে আসিবার অল্পদিন পরেই কোচবিহারের মহারাজের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহ ব্যাপার এক ঘোর পরীক্ষা। ইহার জন্য কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বন্ধু বিচ্ছেদ, মনঃপীড়াই এ পরিবারকে সহ্য করিতে হয়। কত লোকে সতীকে এ জন্য কত কথাই বলেন। সেই সকল অবিশ্বাস বাক্য নিরাকরণের নিমিত্ত দেবীর মুখ হইতে জলন্ত অগ্নির মত এক এক কথা বাহির হইত। তিনি সদাই বলিতেন যে, তাঁর দেবস্বামী যাহা করেন, বলেন, তাহা "অভ্রান্ত সত্য।"



কোচবিহার বিবাহ।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত কোচবিহারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শুভ বিবাহ শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনের এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। এই বিবাহের বিবরণ আমরা এই খানেই সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

কোচবিহার রাজ্য বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর অতি শৈশব কালে পিতৃহীন হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে তিনি সুশিক্ষিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করেন। তখন রাজার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। বিলাতে নানা প্রকার প্রলোভন পরীক্ষা আছে ভাবিয়া এবং রাজপিতামহী ও রাজমাতার ইচ্ছানুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিবাহ দিয়া তবে বিলাতে পাঠাইতে চান। কিন্তু এমন সুশিক্ষিত উচ্চহৃদয় রাজাকে তাঁহার জাতীয় প্রথানুসারে বিবাহ দিলে রাজার উপযুক্ত হইবে না এই ভাবিয়া তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব-

চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী শুনিয়া তাঁহারই সহিত রাজার বিবাহ দিতে অভিলাষী হন।

এই ছোটলাটেরই প্রেরণায় কোচবিহারের তখনকার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী কমিশনর মিঃ ড্যাল্‌টন কেশবচন্দ্রকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন "আপনি অবশ্যই জানেন বিহারের রাজাকে আমরা ত শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছি; কিন্তু যদি সৎপাত্রীর সহিত রাজার বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আপনি গবর্ণমেণ্টের বন্ধু এবং দেশেরও হিতাকাঙ্ক্ষী। আমরা যাহা করিয়াছি তাহার শেষরক্ষা যদি আপনি করেন তাহা হইলেই হয়। আপনি আপনার সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিলেই আমাদের কার্য্য সফল ও পূর্ণ হয়।"

শ্রীকেশবচন্দ্র পত্র পাইয়া এই বিবাহ প্রস্তাবে ঈশ্বরেরও আদেশ শ্রবণ করিলেন। কিন্তু তিনিই ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে নিয়ম করেন যে সাধারণতঃ পাত্রের বয়স ১৮ বৎসর এবং কন্যার বয়স ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। যদিও তাঁহার চিরকালের মত এই যে, "পরিণয়ের বয়স প্রকৃতির দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে, কারণ স্বভাবের বিধানই

ঈশ্বরের বিধান”, তথাপি এ দেশের সাধারণ নরনারীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়াই চিকিৎসকগণ একটা মোটা-মুটীরূপে সিদ্ধান্ত করেন যে, বালিকার চৌদ্দ বৎসরে এবং বালকের আঠার বৎসরে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহা হইতেই কেশবচন্দ্র চিকিৎসকের মত বিজ্ঞানের মত বিশ্বাস করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে সম্মতি দান করেন। তা ছাড়া আইন করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স স্থির না রাখিলে আইন হয় না। সেইজন্যও বিবাহের বয়স ঐরূপ নির্দ্দেশ করেন। দেশ ভেদে, স্বাস্থ্যের অবস্থা ভেদে পরিণয়ের বয়স যে বিভিন্ন হইবেই এবং যৌবনের লক্ষণ প্রকাশ কালই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিবাহ কাল ইহাই কিন্তু তাঁহার আপন স্থির ধর্ম্মমত।

যাহাহউক, প্রস্তাবিত সময়ে কন্যার বয়সও ঠিক ১৪ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাস মাত্র বাকী ছিল, এবং রাজার বয়সও ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই; এই নিমিত্ত তিনি প্রস্তাবকারী মিঃ ড্যাল্টন সাহেবকে লিখিয়া পাঠাই-লেন, পাত্র ও পাত্রীর বয়স পূর্ণ না হইলে এখন কিরূপে বিবাহ হইবে? তবে রাজা বিলাত হইতে তুই বৎসর পরে ফিরিয়া না আসিলে পাত্র পাত্রী স্বামী-স্ত্রী-ভাবে বাস

করিবেন না, যদি এইরূপ বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে বাক্‌দান স্বরূপ আপাততঃ বিবাহ-অনুষ্ঠান হইতে পারে। প্রস্তাবকারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। ইহাতে আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মবাণীর সায় পাইয়া কেশবচন্দ্রও এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু কি ভাবে কেশবচন্দ্র বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার প্রতি অবিশ্বস্ত ও বিরক্ত ছিলেন তাঁহারা কতই অযথারূপে তাঁহার নিন্দা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সংবাদপত্র প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, সভাসমিতিতে কেবলই কেশবচন্দ্রকে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিয়া আপনাদের বিদ্বেষভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মনেতা নিজেই নিয়ম করিয়া নিয়ম ভাঙ্গিতেছেন এবং অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ করিতেছেন, এই কথা তুলিয়া অনেক সরল মতি সহজবিশ্বাসী ব্যক্তিকেও আন্দোলনকারীগণ দলে টানিয়া লইতে বদ্ধ পরিকর হন। এমন কি বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে কিম্বা বিবাহস্থলে যাহাতে কেশবচন্দ্র বিশেষরূপে অপমানিত হন এবং বিবাহে

নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহারও চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

যাহাহউক, ধর্ম্মবীর ব্রহ্মানন্দ একমাত্র আপন ইষ্ট দেবতার মুখের দিকে তাকাইয়া এবং তাঁহারই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামভাবে বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধিদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া তাঁহার চির বিশ্বাস, তাই তাঁহাদের বাক্‌দান অঙ্গীকারে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাদেরই প্রস্তাব অনুসারে কন্যাকে কোচবিহারে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে তিনি স্বীকৃত হন এবং সস্ত্রীক সপরিবারে ও সবান্ধবে সেখানে বাক্‌দান অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই মহারাজা শ্রীমৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরও একেশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার ও একাধিক বিবাহে অস্বীকার পূর্ব্বক এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন।

যাত্রাকালে বহুপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া কোচবিহারে পোঁছাইলে কন্যাসহ দেবী ব্রহ্মনন্দিনী, মা সারদাদেবী ও শিক্ষয়িত্রী মিস্ পিগট রাজ অন্তঃপুরে আহুতা হন। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ তাঁহাদের প্রথানুসারে বিবাহ হইবে না জানিয়া সতীকে অত্যন্তই কঠোর দুর্ব্বাক্য বলিয়া তিরস্কার করিয়া নির্যাতন করেন

এবং তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত তাচ্ছিল্য ব্যবহারও করেন। সতী কিন্তু তাহাতে একান্ত মর্ম্মবেদনা পাইয়াও অনির্ব্বচনীয় সহিষ্ণুতা সহকারে সে সকলকে ভগবান প্রদত্ত ক্রশ মনে করিয়া বহন করিলেন। জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন সেরূপ অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন কেহই করিতে পারিতেন না।

এদিকে সম্ভবতঃ বিরোধীদিগের প্ররোচনায় রাজার হিন্দু কর্ম্মচারীগণও ব্রহ্মানন্দের মতে অনুষ্ঠান করিতে দিবেন না বলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া নানাপ্রকার কৌশলে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। উপাসনার সময় ঢাক ঢোল বাজাইবার এবং একদিকে কোচবিহারের প্রথানুসারে ঘটাদি রাখিবারও আয়োজন করেন, কিন্তু তাহাতে কেশবচন্দ্রের আপত্তি শুনিয়া মিঃ ড্যালটন সাহেব দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা ভয়ে বলেন "ও সব কিছুই নয়।" তাঁহারাই যখন "ওসব কিছু নয়" বলিলেন তখন তাহা লইয়া বৃথা বাদ প্রতিবাদ অনাবশ্যক এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ্চ বিরোধী কর্ম্মচারীদিগের নানা প্রকার ব্যাঘাত উৎপাদন চেষ্টা সত্বেও যথাবিহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কনিষ্ঠ শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেনের দ্বারায় বাক্‌দান অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীকেশবচন্দ্র কন্যাকে লইয়া

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজাও আর নূতন রাণীর সহিত একদিনও একত্র বাস না করিয়া বিলাত চলিয়া যান। তিনি ফিরিয়া আসিলে দুই বৎসরের পর ১৮৮০ সালের ২০শে অক্টোবর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে রাজারাণীকে একত্র করিয়া বিশেষ উপাসনা করতঃ বিবাহবন্ধন দৃঢ় করা হয়। অতঃপর ব্রহ্মানন্দ তাঁহা-দিগকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলে তাঁহারা বিবাহিত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন।

বাক্‌দান অনুষ্ঠানের পর একদিন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এক সময় যে উপদেশ দেন "ধর্ম্মতত্ত্ব"* হইতে আমরা এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

১। "বড় সংসার ব'লে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন তাঁকে পিতা বলে ভালবাস্‌বে।

২। "সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবে; বড় বড় বিদ্বান্‌ আপনার মনের মত কাজ ক'রে মরে।

৩। "কোন পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবেনা। আর দেবতা নাই, সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে; আমি রাণী চাইনা, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য

* (কোচবিহার—সোমবার প্রাতঃকাল, ১৪ই ফাল্গুন—১৭৯৯ শক।)

দেবতার কাছে মাথা হেঁট করিও না। সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে, সম্পদে তাঁহাকেই ডাকিবে। দশজন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ ব'লে ভালবাসে। তিনি তোমাকে ভালবাস্‌বেন। তিনি তোমাকে ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন! তুমি আর একবার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর।"

কোচবিহারের মহারাজা শ্রীমৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণকেও তিনি ইং ১৮৭৯ সালে জন্মদিন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় যে উপদেশ দেন তাহারও অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে হয় না, কারণ কোচবিহার বিবাহ কি উদ্দেশ্যে তিনি দিয়াছিলেন তাহার আভাস এই সমুদয় উক্তির দ্বারাও বুঝা যাইবে। শ্রীকেশবচন্দ্র লেখেন :—

"ধর্ম্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য—আত্মাতে এবং সত্যেতে প্রতিদিন ঈশ্বরের পূজা করিবে এবং তোমার প্রার্থনা যেন সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ট হয়। ঈশ্বরকে তোমার পিতা মাতা জানিয়া ভালবাসিবে, তাঁহাকে তোমার প্রভু জানিয়া অনুসরণ করিবে; তোমার রাজা ও বিচারক জানিয়া

ভয় করিবে, তোমার বন্ধু জানিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমার পরিত্রাতা জানিয়া পূজা করিবে। সৌভাগ্যের সময় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে, বিপদ দুঃখের সময় সাহায্যের জন্য তাঁহারই দিকে তাকাইবে। সকল অবস্থাতে ঈশ্বর-পরায়ণ হইবে; তিনি ইহলোক এবং পরলোকে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

"নৈতিক।—তোমার রিপুকে সংযত করিবে এবং সকলের প্রতি দয়া ও ক্ষমাশীল হইবে। সৎসাহস ও মনুষ্যত্ব সহকারে সত্য বলিবে। গরীবের সাহায্য করিবে, দুঃখীকে সান্ত্বনা দিবে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিবে। ন্যায়বান হইবে, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবে।

"পারিবারিক।—তোমার মাতাকে ভক্তি করিবে। অবিচলিত বিশ্বস্ততা সহ তোমার স্ত্রীকে ভাল বাসিবে। তোমার সকল আত্মীয় স্বজনকে প্রীতিপূর্ণ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে। পবিত্র এবং সুখী পরিবারেরই সুখ অন্বেষণ করিবে।

"শারীরিক।—যত্নপূর্ব্বক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে, কারণ শরীরই আত্মার বাস ভবন। বিশুদ্ধ বায়ু তোমার রক্তকে পরিষ্কার করুক এবং পুরুষোচিত ব্যায়াম তোমার

অঙ্গকে বলীয়ান করুক। তোমার আহার নিয়মিত এবং মিতাচার সম্পন্ন হউক, যেন অল্প কিম্বা অধিক না হয়।

'সকাল সকাল শয়ন ও সকাল সকাল উত্থানের' বিধি অবলম্বন করিবে। যাহাতে মত্ততা হয় এমন দ্রব্য স্পর্শ বা আস্বাদন করিবে না।

"জ্ঞানবিষয়ক।—তোমার মনকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চয় দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং এমন ভাবে অধ্যয়ন করিবে যাহাতে মনে প্রজ্ঞা ও সাধনপরতন্ত্রতা বিধান করে। সৎ পুস্তক সকলকে বন্ধু বলিয়া এবং নির্জ্জনের সঙ্গী বলিয়া ভালবাসিবে। শিক্ষারই জন্য শিক্ষার আদর করিবে এবং বিজ্ঞানে আনন্দ অন্বেষণ করিবে। চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, তত্ত্বালোচনা এবং মানব চরিত্র ও সকল বস্তু অধ্যয়ন দ্বারা তোমার শিক্ষাকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে।

"সামাজিক।—সকলের প্রতি প্রিয় ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। নারী জাতিকে সম্মান করিবে। যাঁহারা তোমাপেক্ষা বয়সে, সম্মানে বা বিদ্যায় জ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। সমাজে তোমার উপযুক্ত পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবে। তোমার মর্য্যাদানুরূপ বেশভূষা করিবে; তাহা মূল্যবানীয় হইবে, কিন্তু বেশী জমকাল নহে।

"রাজনৈতিক:—তোমার সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ভক্তি করিবে, যাঁহাকে ঈশ্বর এদেশ শাসনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আইন অধ্যয়ন করিবে, ন্যায় বিচার ও আইনের উচ্চ ভাব আলোচনা করিবে এবং যখন তুমি রাজত্ব করিবার উপযুক্ত হইবে, তখনকার উপযোগী রাজ-মর্য্যাদানুরূপ জ্ঞানেতে এবং নীতিতে আপনাকে সুশিক্ষিত করিবে। তোমার উচ্চ ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং মহান দায়ীত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। ছয় লক্ষ লোক উচ্চ আশান্বিতচিত্তে তোমার রাজ্যশাসনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রজাদিগকে সুশাসনের নৈতিক এবং বৈষয়িক সৌভাগ্য বিধান করা তোমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক এবং ঈশ্বরের আলোক যেন তোমার রাজ্যকে আদর্শ রাজ্য করিতে তোমার সহায় হয়।"

এইখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক কেশবচন্দ্র এই বিবাহ অর্থলোভে দিয়াছিলেন বলিয়া বিরোধীগণ যে মিথ্যা ধুয়া তুলেন, ইহার অলীকতা প্রমাণের জন্য ব্রহ্মানন্দ নিজে রাজার একপয়সাও ছুঁইতেন না বা লইতেন না। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল ঈশ্বরাদেশ পালন জন্যই এই বিবাহ দান করেন, ইহা বরং তাঁহার জীবনের মহা অলোভ ও ত্যাগেরই পরি-

চায়ক। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ নিজে পরে যে প্রার্থনা করেন তাহাতেই সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন, কেন এই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি এই প্রার্থনায় বলেনঃ—

"দীনবন্ধু, আমি মার খাইয়াছি, অনেক সহিয়াছি; কিন্তু যখনই তুমি চাহিলে, তখনই তোমার পদতলে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। আমার কন্যা নয় তোমার সমাজের কন্যা, প্রেরিতদলের কন্যা। তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না।

"তুমি যখন চাহিলে, বলিলে, "আমি বিহারে অমৃত ঢালিব, আমি বঙ্গদেশের দুই শাখায় বিবাহ দিব, দুই প্রদেশ বদ্ধ করিব, কন্যা দাও, আমি দুই দেশের মিলন করিব, আমি নবরক্ত দিয়া নবইস্রেল এই বিহারকে নির্ম্মাণ করিব।" তুমি কাণে কাণে বলিলে, আর আমি মাথা দিলাম। দুঃখিনী কন্যা দিলাম—যে আমার ঘরে দুঃখে ছিল।

"কিন্তু আমি একদিনের জন্য মনে করি নাই যে, সম্পদ্, মান, কিম্বা ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার অনুজ্ঞা পালন করিলাম; তুমি চাহিলে, আর আমরা কয়টী লোকে তোমার কন্যাটীকে এগিয়ে দিলাম, অন্ধকারের মুখে। * * দুই দেশ এক হইল।

"আজ বিধান পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে, আশীর্ব্বাদ কর আমরা মাতৃলীলা দেখিতে দেখিতে খুব বিশ্বাস করি। সকলে মিলিয়া ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।"

ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দের স্পষ্ট আত্মনিবেদন আর কি হইতে পারে? তিনি যে এ বিবাহ "সম্পদ, মান ঐশ্বর্য্যের জন্য" দেন নাই; কিন্তু "সুনীতির সঙ্গে সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে", "দুই দেশ এক হইবে", "নবরক্তে নব ইস্রেল নির্ম্মাণ হইবে" এই বিশ্বাসেই দেন, এইত প্রাণ খুলিয়া আপন ইষ্টদেবতা সম্মুখে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বিরোধীগণ ভীষণ আন্দোলাগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং অখণ্ড ব্রাহ্মমণ্ডলীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে এক স্বতন্ত্র সমাজ খুলিয়া বসিলেন। যাঁহারা এক পরিবারের ন্যায় ভাই ভগিনীরূপে এত দিন একত্র বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরস্পরকে অতি বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু একজন ব্যতীত সকল প্রচারক ও মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিগণ অনেকেই ব্রহ্মানন্দের পক্ষে চিরসংযুক্ত রহিলেন।

এই কোচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে সতীরও কি ভাব ছিল তাঁহার নিজ প্রার্থনা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। তিনি প্রতি বর্ষে এই বিবাহ দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারই একটী প্রার্থনা হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"হে ভক্ত-বৎসল ঈশ্বর, ভক্তের সঙ্গে তোমার যে লীলা তা' তুমি বোঝ, আর তোমার ভক্ত বোঝেন; পৃথিবীর লোক তাহা অতি অল্পই বোঝে। আজকার দিন তোমার কোচবিহারের বিবাহ। তোমার ভক্তের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা মনে হচ্ছে। তাঁর ভাব কে বুঝ্বে? এখনও লোকে তাঁকে অবিশ্বাস করে?......

"এই সুনীতিরত্ন দিলে তুমি ইহার জীবনে কত লীলা দেখালে। ইহাঁর ধৈর্য্য-সহ্যগুণও তেমনি দিয়েছ।...

"তোমার পুত্র এব্রাহম্ অনায়াসে তাঁর সন্তানকে তোমার আজ্ঞায় বলি দিতে গেলেন, তেমনি তোমার ভক্তের বিশ্বাসও ভয়ানক আশ্চর্য্য! তোমার উপর বিশ্বাস করে তোমাকে কন্যা দিলেন।...কুচবিহার অসভ্য দেশ ছিল, এখন সুনীতিকে দিয়ে তাদের মধ্যে সুনীতি আন্‌লে। কেহই তোমার ভক্তকে সুখী কত্তে পারে নাই। তোমার ভক্ত-হৃদয়ে কত তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষিত হয়েছিল।

তিনি বলিলেন "আমার ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ আমাকে বিশ্বাস করেন না। আমার স্ত্রী, আমার মা, কেহই বিশ্বাস করিলেন না।" বড় কষ্ট পেলেন তিনি। বড় গাছে বড় ঝড় আসে। তোমার সুনীতিরও কত পরীক্ষা কত কষ্ট, রাজ্যভার মস্তকে। মহারাজাও ত এখনও বুঝ্‌লেন না কেন ভক্ত এ বিবাহ দিলেন? মা তোমার বিধান পূর্ণ হবে এই বিধানে।···তোমার সুনীতিকে, রাজকুমার, রাজ-কুমারী ও···মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

এই আন্দোলন সময়ে আচার্য্যদেবকে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিবে, এই বলিয়া একদিন এক উড়ো চিঠি আসে, ইহাতে অবশ্যই সতীর প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস জাগ্রত রাখিবার জন্য সতী কন্যাদের গান গাহিতে বলিলেন "কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর স্মরণ!"

ব্রহ্মানন্দ এবং সতী জগন্মোহিনী যদিও কখনই বিরোধীদিগকে কোন প্রকার বিরুদ্ধভাবে দেখেন নাই, বরং তাঁহাদের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে ব্রহ্মানন্দ যথাসাধ্য চাঁদাও দান করেন, কিন্তু এই মহা আন্দোলনে ও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি দ্বারা দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহাদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।

ব্রহ্মানন্দ একদিন বলিলেন, "এক একটী ব্রাহ্ম চলিয়া যান, আমার এক একখানি বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া যায় ; আর এতগুলি ব্রাহ্ম ভাই ভগিনী চলিয়া গেলেন, ইহা কি আমার সহ্য হয়?" এই বলিয়া তিনি মিলন আশায় পরে একবার সাধারণ সমাজ মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াও আসেন। কিন্তু পাছে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন, এই ভয়ে সমাজের অধ্যক্ষগণ দরজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতেও তিনি অপমান বোধ না করিয়া বলেন, "উঁহারা ঢুকিতে দিলে মিলন এগিয়ে যেতো, যা হোক্ যখন প্রণাম ক'রে এসেছি, ও মন্দির আমার মারই হবে।" ভবিষ্যৎ মিলনের ইহাও আশাবাণী।

যাহাহউক, এই মর্ম্মান্তিক বেদনায় ও ভাবনায় ব্রহ্মানন্দের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং তিনি শীঘ্রই অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন ; এমন কি তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

স্বামীর পরীক্ষা দেবীরও এক বিষম পরীক্ষার সময়। কোচবিহারে রাজাকে কন্যা দান করায় জাতিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, আত্মীয় স্বজনেরাও নানাপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়া তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা দেন। বিশেষতঃ আচার্য্যদেবের এই সময় যে কঠিন পীড়া হয় তাহাতে

তিনি নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়েন। চিকিৎসকেরা রোগীর অবস্থা ভাল নয় দেখিয়া গঙ্গার উপর বেড়াইবার পরামর্শ দিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবীর ক্রোড়ের চতুর্থ কন্যাটী তখন নিতান্ত শিশু। তিনি এই শিশু কন্যাটীকে লইয়াই স্বামীর সঙ্গে জলপথে বেড়াইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কমল-কুটীরে অন্যান্য ছোট বড় সকল সন্তানগুলিকে রাখিয়া গেলেম। বোটে সতী ও তাঁর শিশু কন্যা ব্যতীত মা সারদা দেবী ও সেবা শুশ্রূষার জন্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও ছিলেন। একদিন নাকি বোট মহা ঝড় তুফানে পড়িয়া একেবারে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান এ ঝড়েও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করিলেন। যাহাহউক কিছুদিন এইরূপে বোটে করিয়া গঙ্গার উপর বেড়াইয়া, পরিশেষে কাশীপুরে একটী দ্বিতল বাটীতে আচার্য্যদেবকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কিছুদিন থাকায় শরীর সুস্থ হইলে তাঁহাকে আবার কমলকুটীরে আনয়ন করা হয়। এই কাশীপুরের বাটীতে সতী সকল পুত্র কন্যাগণকেই লইয়া গিয়াছিলেন।



কোচবিহার বিবাহের পরবর্ত্তী কাল,—
নববিধানের অভ্যুদয়।

উত্তাপ পাইলে ডিম্ব যেমন ফুটিয়া উঠে এবং পূর্ণ-অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন পক্ষীশাবক বাহির হইয়া যথাসময়ে নৃত্য গীত করিতে করিতে সর্ব্বজনে আনন্দ বিতরণ করে, কোচবিহার বিবাহের ভীষণ আন্দোলন ও তাহার সহিত অপমান, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার উত্তাপে ব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর হৃদয় নিহিত ধর্ম্মোৎসাহ দমিত না হইয়া, বরং তাহা আরও উজ্জ্বলতররূপে ফুটাইয়া তুলিল ; এবং এত দিন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বীজাকারে ছিল তাহা হইতেই পূর্ণাবয়বসম্পন্ন এক নব ধর্ম্মবিধান প্রস্ফুটিত হইল।

বিচারপরতন্ত্র জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন কেবল হিন্দু বেদান্তধর্ম্মের অন্যতম সংস্করণরূপেই প্রচারিত হইতেছিল, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া যদিও ইহাতে কিছু কিছু সর্ব্বজনীন-ভাব সঞ্চার করিতেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মের জ্ঞানপ্রধানতা-বশতঃ যেন সে সকল ভাব ভালরূপ গজাইতে না পারিয়া জ্ঞানগতই হইতেছিল, এখন তাঁহারা তাঁহাকে

ত্যাগ করাতে যেন আওতা কাটিয়া গেল এবং সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অঙ্কুর হইতে সুন্দর ফলপুষ্প-শোভিত নবজীবন-প্রদ নববিধান-বৃক্ষ মাথা তোলা দিয়া উঠিয়া পড়িল।

অথবা ব্রহ্মানন্দ তাঁহার দলের মুখাপেক্ষী না হইয়া বা আপনার মানমর্য্যাদা, এমন কি আত্মধর্ম্ম মতেরও উপেক্ষা করিয়া যে প্রত্যক্ষ ভগবানের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং যায় যাক্ প্রাণ মান বলিয়া তাঁহারই চরণে ঝাঁপ দিলেন ও সেই প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসের জন্য সস্ত্রীক সপরিবারে মহানির্য্যাতন পীড়ন ও ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা অকাতরে সহ্য করিলেন, তাহারই শুভাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভক্তসখা ভগবান তাঁহাকে নববিধান-রূপ মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন।

এই নববিধানের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজে সম্পূর্ণ এক নবজীবনদায়িনী নবধর্ম্ম বিকাশ হইল। ব্রহ্ম-দর্শন শ্রবণ, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলন, ঈশা মুষা বুদ্ধ মহম্মদ ও ঋষিদের সমাগম, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানাদি সর্ব্বধর্ম্মে বিধান স্বীকার এবং তাহার সকল ভাব ও সাধন জীবনে পরিণত করিবার আবশ্যকতা, বিশ্বাস প্রেমের প্রাধান্য এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য এবং সংসারে বৈরাগ্য সাধন ব্রাহ্মসমাজে বা কোথাও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই।

তাই ব্রহ্মানন্দ নববিধান আবিষ্কার করিয়া কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন সমগ্র ধর্ম্মজগতে সত্যই এক নব-জীবন সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং পৃথিবীতে যে এক নব-যুগ আনয়ন করিলেন ইহা বলা বাহুল্য। এতদিন যে ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র হিন্দুসম্প্রদায়রূপে পড়িয়াছিল, এখন সার্ব্বভৌমিক এবং সর্ব্বজনীন ধর্ম্মবিধান তাহা হইতেই উদ্ভূত হইল। এখন কেবল ধর্ম্মমত নয় কিন্তু শাস্ত্র, মন্ত্র, তীর্থ, হোম, জলসংস্কার ইত্যাদি সকল ধর্ম্মভাবসম্পন্ন সর্ব্বজনের পরিত্রাণের জন্য বিধাতা প্রেরিত নবধর্ম্মবিধান অভ্যুদিত হইল।

ধর্ম্মের এই নব পরিণতিতে মণ্ডলী মধ্যে নব নব কার্য্যোদ্যম, নব নব সাধন-ভজনোৎসাহও বিকশিত হইয়া উঠিল। বিদ্বেষ হিংসায় একদিকে যেমন কেশববিরোধী-গণ আত্ম-বিস্মৃত হইতে লাগিলেন, শ্রীকেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহচরদিগকে আক্রমণ করাই যেন তাঁহাদের প্রধান কাজ হইল, ব্রহ্মানন্দ কিন্তু এক নূতন দিকে উন্নতধর্ম্মের দিকে আপন মণ্ডলীর পাইল ফিরাইয়া দিলেন এবং প্রতিদিনই এক একটা নূতন নূতন সাধন, নূতন নূতন অনুষ্ঠান, নূতন নূতন কার্য্যের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুরাগে উন্নত করিয়া তুলিলেন।

বাস্তবিক, নববিধান ঘোষণার পর হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিনই এক একটা যেন নূতন উৎসব করিতে লাগিলেন। আজ বক্তৃতা, কাল কীর্ত্তন, তার পরদিন হোম, তার পর জলসংস্কার, তার পর প্রেরিত প্রেরণ, তার পর সাধকমণ্ডলী ও যুবক শিক্ষার্থী দল গঠন, তার পর মহিলাদিগের দ্বারা নিশানবরণ, আর্য্যনারীসমাজ গঠন, নববিধানপত্রিকা প্রচার, নববৃন্দাবন নাটকাভিনয় ইত্যাদি কত প্রকারের সাধনাতেই যে আপন অনুচরদিগকে তিনি নিযুক্ত করিলেন তাহা বলা যায় না।

নববিধানের এই নব আন্দোলনে ব্রহ্মানন্দ যেমন একদিকে পুরুষদিগকে মাতাইলেন, তেমনি ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর সহায়তায় নারীদিগকেও যথেষ্ট উৎসাহিত করিলেন। নববিধানের যে যে অনুষ্ঠান বাহিরে পুরুষদিগকে লইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্পাদন করিলেন, অন্দরে স্বতন্ত্রভাবে জগন্মোহিনী দেবীও নারীদিগকে লইয়া তাহা সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি নারী-দিগের একটী স্বতন্ত্র দলই গঠন করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা, কীর্ত্তন এমন কি নারী-দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারেরও অনুষ্ঠান করিলেন। এক-দিকে পুরুষেরা জলসংস্কার লইয়া চলিয়া গেলেন, তাহার



আর্য্যনারীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ।

পরেই সতী আপন নারীদলবল লইয়া জলসংস্কার লইলেন। একদিকে পুরুষেরা কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন, অপর দিকে সতীও নারীদের দ্বারা খোল করতাল বাজাইয়া মঙ্গলপাড়ায় কীর্ত্তন করিতে গেলেন। এইরূপে নারীদিগের মধ্যেও সতী নববিধানের নব ভাব সকল সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়ে সতী জগন্মোহিনী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া অভিনেতাদের সেবা ও সহায়তা করেন, এমন কি আপন শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও অভিনয়ের সাহায্য ও ব্যবস্থাদি করিতে ক্রুটী করেন নাই।

তাঁহারই উৎসাহে নারীদিগের জন্য "আর্য্যনারী সমাজ" সংগঠিত হয়, পূর্ব্বকার দেশীয় মহিলাদিগের "নরম্যাল বিদ্যালয়" নামে নারীবিদ্যালয় "ভিক্‌টোরিয়া কলেজে" পরিণত হয় এবং নারী "ভগ্নীদল" অনুষ্ঠিত হয়। আরো প্রধানতঃ নারীদিগের দ্বারা প্রবন্ধ লিখিত হইয়া "পরিচারিকা" মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। অধিক কি নারীকুলের ধর্ম্মজীবন উন্নতি সাধন বিষয়ে ব্রহ্মানন্দিনী সতীদেবীর ঐকান্তিকই আগ্রহ ছিল এবং ব্রহ্মানন্দের যোগে যে কোন উপায়ে তাহা সংশাধিত হয় তাহা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

ইং ১৮৭৯ সালের ৯ই মে এই "আর্য্যনারী সমাজ" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বহুপূর্ব্বে যখন ব্রহ্মানন্দ কলুটোলায় অবস্থান করিতেন তখন হইতেই "ব্রাহ্মিকা সমাজ"* সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবল ব্রাহ্মিকা-দিগের সমাজ নয় ইহাকে সর্ব্বজনীন নারী সমাজ বলা যাইতে পারে। যাহাহউক এই সমাজের উদ্দেশ্য ও কি ভাবে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত নিম্নলিখিত মুদ্রিত নিয়মাবলী হইতে বুঝা যাইবে।

"আর্য্যনারী সমাজের উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গদেশীয় নারীসমাজের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করা এই সমাজের উদ্দেশ্য।

২। প্রাচীন আর্য্যবংশীয় হিন্দু মহিলাদিগের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুসারে সংস্কার কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

৩। শরীর ও মন আত্মা তিনেরই সংস্কার আবশ্যক।

৪। নরনারী উভয়েই মনুষ্য জাতির অন্তর্গত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিভিন্ন প্রকৃতি এবং যদ্যপিও তাঁহাদের সাধারণ কর্ত্তব্য

---

* ব্রাহ্মিকা সমাজ সর্ব্বপ্রথমে প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসুর বাসাবাড়ীতে আরম্ভ হয় এবং শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্রই ইহার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হন।

আছে, তথাপি আবার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এবং বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। নারীর পক্ষে কেবল পুরুষের অনুকরণ ধর্ম্ম নহে।

৫। হিন্দুজাতীয় স্ত্রীদিগের সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিজাতীয় রীতি অনুকরণ ভাল নহে। জাতীয় ব্যবহারে যাহা কিছু কল্যাণকর আছে তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬। সমাজ সংস্কার ধর্ম্মমূলক হইবে। কেবল সভ্যতা বা বিলাসিতার অনুরোধে দেশীয় পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা অন্যায় ও অনিষ্টকর। ধর্ম্মভাবের উপর সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করা বিধেয়।

৭। ধর্ম্ম এবং জাতীয় ব্যবহারকে মূলে রাখিয়া অপরাপর দেশ ও জাতীর মধ্যে যাহা কিছু কল্যাণকর আছে, তাহা উদার ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে নারীভাব প্রস্ফুটিত করাই নারী জাতীর উন্নতি চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।

[দেহ মন ও আত্মার উন্নতি]

১। প্রত্যহ স্নান ও গাত্রশুদ্ধি, পরিমিত আহার ও নিয়মিত সময়ে আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কৃত বসন পরিধান, যথা সময়ে নিদ্রা, এই সকল শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে।

২। ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়া প্রকাশক বিজ্ঞানতত্ত্ব, সাধ্বী নারীদিগের জীবন, ধর্ম্মোপদেশ, নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে।

[সামাজিক ও গৃহধর্ম্ম।]

১। সংসারে পতিসেবা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। পাতিব্রত্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে উহা পালন করিতে হইবে।

২। অপরিমিত ব্যয় দ্বারা স্বামীকে ঋণগ্রস্ত করা অন্যায়। আয় অনুসারে ব্যয় করা উচিত।

৩। ধর্ম্মের শাসন অতিক্রম করিয়া যথা তথা গমনাগমন ও যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ। যে স্বাধীনতা দ্বারা সাধু সহবাসে জ্ঞানধর্ম্ম সঞ্চয় করা যায় তাহাই প্রার্থনীয়।

৪। মন্দিরে বা ধর্ম্মসাধন উপলক্ষে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে বেশ ভূষার বাহুল্য পরিহার্য্য।

৫। সন্তানদিগকে সৎশিক্ষা দিতে হইবে।

৬। রন্ধন প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে সুদক্ষ হইতে হইবে।

৭। দীন দুঃখীদিগকে সঙ্গতি অনুসারে অর্থ ও পুরাতন বস্ত্র তৈজসাদি দান করা কর্ত্তব্য।

৮। শুভ কামনা করিয়া সময়ে সময়ে ব্রতাদি গ্রহণ আবশ্যক।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ দেহে অবস্থান কালে এই "আর্য্যনারী সমাজের" নেতা ও সভাপতি ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর ক্রমে সতী জগন্মোহিনী দেবী এই সমাজের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ইহাকে প্রাণপণে রক্ষা করেন। এই কার্য্যে সতীর এতই নিষ্ঠা ছিল যে একবার কনিষ্ঠ পুত্রের মরণাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও তাহাকে ফেলিয়া যথা সময়ে "আর্য্যনারী সমাজের" সমুদয় আয়োজন করেন।

মহিলাদিগের জন্য "ভিক্টোরিয়া"* বিদ্যালয় স্থাপনে যদিও সতীর বাহিরে যোগ অধিক ছিল না, কিন্তু উহাতে তাঁহার অন্তরের সহানুভূতি এবং উৎসাহ যথেষ্টই ছিল। এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান পত্রের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেই আধুনিক মহিলাগণ এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন, এজন্য এই অনুষ্ঠান পত্র ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া এখানে দেওয়া হইল।

* এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানভার প্রথম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় গ্রহণ করেন।

"বয়ঃস্থা দেশীয় মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষা-বিধানের নিমিত্ত একটী বিদ্যালয়ের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। দেশে যে সকল বালিকাবিদ্যালয় রহিয়াছে এবং বৎসর বৎসর যাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, অবশ্যই তাহারা বালিকাদিগের শিক্ষা-বিধানের কার্য্য যথেষ্ট সফলতা সহকারে ও সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র, এই শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বনের আবশ্যক।

"ভারত-সংস্কারক সভার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী এই মহান জাতীয় অভাব মোচন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। নারী-মনের উপযোগী ও নারীগণ যাহাতে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থার অনুরূপ কার্য্যক্ষম হইতে পারেন, এইরূপ একটী বিশেষ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য।

"ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, নারীগণের স্ত্রীজাতিসুলভ ভাব ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন উপযোগী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। পুরুষদিগের উপযোগী সম্মান ও উপাধিলাভের জন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষালাভে বাধ্যকরা বিশেষ অনিষ্টকর ও

প্রতিবাদ-জনক। অতএব যে পুরুষোপযোগী শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধভাব আনয়ন করে এবং যে শিক্ষার দ্বারা বাহ্যিক চাকচিক্য ও সভ্যভব্যতা আনিয়া তাঁহাদের প্রবৃত্তিকে নীচ করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সে প্রকার শিক্ষা সাবধানতাসহ পরিত্যক্ত হইবে।

"একেবারে স্বাভাবিক ও জাতীয়তা সম্পাদক প্রণালীর শিক্ষা অবলম্বনে হিন্দুনারীচরিত্রের প্রকৃত ভাব পরিস্ফুট করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য কমিটী উপদেশ, পরীক্ষা এবং পুরস্কারাদি দ্বারাই বিশেষতঃ শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিতে চান।

"কলিকাতায় কথোপকথনচ্ছলে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে, একং পূর্ব্ব হইতে তাহার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রধানতঃ বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে ঃ—

প্রাথমিক বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও ভূগোল, পারিবারিক অর্থনীতি, হিন্দুনারীচরিত্রের উচ্চ দৃষ্টান্ত। পাটীগণিত, চিত্রবিদ্যা ও শুচিকার্য্যও শিক্ষার বিষয় হইবে।

"যে সকল মহিলা এই সকল বক্তৃতায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইবেন, মুদ্রিত প্রশ্নপত্রের দ্বারা তাঁহাদের পরীক্ষা

গ্রহণ করা যাইবে। কলিকাতা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সকল মহিলা এই পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন, পরীক্ষক সমিতি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণকে পুস্তক ও গহনা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, এবং প্রশংসা-পত্র ও পঞ্চাশ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক বৃত্তিও দেওয়া হইতে পারে।

"দেশীয় মহারাজকুমারীগণ, রাণী, মহারাণীগণ, এবং উচ্চপদস্থা মহিলাগণ, যাঁহারা নারীশিক্ষা বিষয়ে সহানুভূতি করেন, তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা প্রদানে সহায়তা দান করিতে এবং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষিকা হইতে আমরা অনুরোধ করি।

"দেশীয় উচ্চপদস্থা এবং ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগকে লইয়া কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একটী মহিলা কমিটী সংগঠিত হইবে। এই কমিটীর তত্ত্বাবধানে সময়ে সময়ে মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার উপযোগী তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ সামাজিক শিক্ষা দিবার জন্য সম্মানিত ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের বাটীতে নারী-বন্ধুসম্মিলন হইবে।

"শিক্ষার বিষয় স্থিরীকরণ, পরীক্ষক সমিতি নিয়োগ এবং আবশ্যকমত নিয়মাদি স্থিরীকরণ জন্য ভারত-সংস্কারক

সভার সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে একটী সিণ্ডিকেট সভা সংগঠিত হইয়াছে।"

এই বিদ্যালয়ের বক্তৃতাদি এবং সঙ্গীতাদিতে সতী স্বয়ং যে কেবল নিয়মিতরূপে যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাহা নহে, সকল মহিলাকেই তাহা করিতে অনুরোধ ও উৎসাহিত করিতেন এবং অন্যান্য প্রকারেও এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষণ করিতেন।

"পরিচারিকা" নামে মাসিক পত্রিকা প্রধানতঃ মহিলা-দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সতী জগন্মোহিনী দেবী এই পত্রিকায় প্রবন্ধ, পদ্যাদি সর্ব্বদাই লিখিতেন এবং তিনিই তাঁহার বধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবী ও কন্যাগণকে ইহার সম্পাদন কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৮১ সালের ১২ই এপ্রেল নারীদিগকে লইয়া বিশেষ উপাসনা সহকারে একটী রীতিমত নারী-সাধিকাদল বা "ভগ্নীদল" সংগঠিত হয়। ইহাতে নারীগণ নিজ নিজ শিক্ষাসাধন ও ধর্ম্মাধিকার অনুসারে বিশেষ বিশেষ সাধন গ্রহণ করেন এবং আত্মচিন্তা, ধ্যান, আহারাদি বিষয়ে সংযম, সাধু চরিত্রপাঠ, পরোপকার, শিশু ও জীবসেবা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ব্রত গ্রহণ করেন।

একাদশ জন ভগ্নী একত্র হইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে এইরূপ ব্রত ধারণ করেন। কি ভাবে এই ব্রত প্রদত্ত হয়, প্রধান একদলের ব্রতনিয়ম উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে।

ইঁহারা দেবালয়ে উপাসনার পর বিশেষভাবে এই সাধন গ্রহণ করেন ঃ—

"প্রথমে ব্রহ্মের একশত আট নাম স্মরণ ও সাধু-ভক্তদের প্রতি সম্মাননা।

প্রাতে ঋগ্বেদ শ্লোক পাঠ।

মধ্যাহ্নে ভাগবত পাঠ।

সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ।

সাধকদিগকে জল এবং সরবত দান।

স্বহস্তে রন্ধন।

মন্দিরে উপাসনাকালে অবগুণ্ঠন বা মস্তকে বস্ত্রাবরণ।

নির্জ্জন ধ্যান এবং একতারা যোগে নববিধান সঙ্গীত ও অন্যান্য ব্রহ্মসঙ্গীত।

শিশুদিগকে লইয়া সংক্ষিপ্ত পারিবারিক উপাসনা।

চৈতন্য চরিত্র শ্রবণ।"

বালিকা এবং অবিবাহিতা যুবতীদিগকেও এইরূপ অন্যান্য ব্রত দেওয়া হয়।—(ইং "নববিধান পত্রিকা।")

মহিলাদিগের দ্বারা "নিশান" বরণ এবং "আর্য্যনারী সমাজে"র উৎসব ও উপাসনাদিতে সতী জগন্মোহিনী সদা সর্ব্বদাই প্রধান নেতৃত্ব করিতেন এবং নূতন নূতন সঙ্গীত স্বয়ং রচনা করিয়া গান করিতেন বা কন্যাদিগের দ্বারা তাহা গান করাইতেন।

এই নিশান বরণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নূতন। ইহা কোনরূপ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান নয়। নববিধানের প্রতি সম্মাননা সাধন ইহার অভিপ্রায়। এই অনুষ্ঠানে নববিধানের জয়-পতাকা প্রাঙ্গণ মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রচলিত হিন্দুপ্রথা অনুসারে বাতি আলোক লইয়া জয়দাতা বিধাতার ও বিধানের জয়সঙ্গীত করিতে করিতে মহিলাগণ তাহাকে বেষ্টন করেন। ইহা নির্দ্দোষ অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান। ঈশ্বরকে কোন বাহ্য আকারে পূজা বা সম্মাননাই পৌত্তলিকতা, কিন্তু বিধানের নিদর্শন স্বরূপ পতাকার বরণ ঈশ্বরের কোনরূপ মূর্ত্তির পূজা নয়। যেমন বাহিরের খোল কর্ত্তাল পতাকা ইত্যাদি সহায়তারূপে লইয়া কীর্ত্তন করা হয়, ইহাও তদ্রুপ, সাধারণ মহিলাদিগের শিক্ষা সাধনের জন্য তাঁহাদের মনে বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা নববিধানের প্রতি আদর যাহাতে বদ্ধমূল হয় তজ্জন্য এই অনুষ্ঠান।

এই নিশান বরণ সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মানন্দ ইংরাজী "নববিধান পত্রে" বলেন "ঈশ্বরকে গৃহলক্ষ্মী রূপে দেখিয়া গৃহস্থালীর সমুদয় পদার্থ যথা স্বর্ণ, শস্য, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং রন্ধন ও আহার্য্য তৈজসাদি পর্য্যন্ত সমর্পণ করা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। নারী-মনের বিশেষ ভাব অনুসারে এই অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত গৃহকে ঈশ্বরের গৃহ করিতে শিক্ষা দিবে এবং ইহা দ্বারা তাঁহাদের অন্তরের ভাবপ্রকাশ বৃত্তিও চরিতার্থ হইবে।" তিনি আরো বলেন "আমরা মৃত অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না। এই সকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বতন ধর্ম্মমণ্ডলীর তদনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যান মাত্র। নিশান শব্দের পরিবর্ত্তে "স্বর্গরাজ্য" পাঠ করিলেই এ উপমার অর্থ পরিষ্কার হইবে।"

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সতী যে সঙ্গীত রচনা করেন তাহাতেও ইহার উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝা যাইবে, এজন্য তাঁহার রচিত একটী সঙ্গীত এখানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

[বরণ সঙ্গীত]

মায়ের জয় গান করি নববিধানে।
জীবনে মরণে, মায়ের চরণে,
দিবানিশি প'ড়ে থাকি সদানন্দ মনে ;

বীরবর নববিধান, দিগ্বিজয়ী মহীয়ান,
সুখীকর বলী কর সুধাবিন্দু দানে ;
এসেছি মোরা সবে, দীন হীন জনে,
ভক্তসনে ভগবানে দেখ্‌ব প্রাণে প্রাণে ;
আনন্দ হিল্লোলে ভাসি, সদা হাসি হাসি,
নববিধি ছায়াতলে থাক্‌তে ভালবাসি ;
আর্য্য নারীগণে, আশীষ পুণ্যদানে,
গাই সদা গুণগান সুধামৃত পানে।

ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে "আনন্দ-বাজার"ও মহিলাদিগের শিক্ষাসাধনের একটী আনন্দজনক অনুষ্ঠান। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যদিও এই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু দেহে থাকিতে থাকিতে তিনি কার্য্যতঃ ইহা প্রবর্ত্তন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সতী জগন্মোহিনী দেবীর উৎসাহে এবং মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রধান উৎযোগে এই "আনন্দ-বাজার" মহিলাদিগের একটী আনন্দের মেলা স্বরূপ হইয়াছে। এই মেলা উপলক্ষে মহিলাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কারুকার্য্যাদি সকল মহিলাগণ নিজে প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন এবং তদ্ব্যতীত উপাসনা সাধনের সহকারী আসন গৈরীক, একতারা, খোল, কর্ত্তাল, পতাকা, মটো, ধূপ, ধুনা, ধুনুচি, ধূপ দান ইত্যাদি

ও মহিলা এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী নানা-প্রকার দ্রব্যাদিও প্রদর্শন ও বিক্রয় হয়। পুরুষ ও মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র দিনে "আনন্দ-বাজার" হইয়া থাকে। এবং মহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট দিনে এই বাজারে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকে না। কেনাবেচার ভিতর আমোদ এবং তাহার সঙ্গেও ধর্ম্মসাধন ইহার উচ্চ উদ্দেশ্য। পুরুষদিগের দিবসে পুরুষগণ এবং মহিলা-দিগের দিবসে মহিলাগণ খোল কর্ত্তালাদি লইয়া সংকীর্ত্তনাদি করেন। ইহাতে প্রতি বর্ষে বহুসংখ্যক হিন্দু মহিলা অবাধে মহিলাদিগের দিনে বিশুদ্ধ স্বাধীনতাসহ কেনা বেচা ও পরস্পর আলাপ পরিচয়াদি করিয়া কতই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই বাজারের বিক্রয় লব্ধ লাভ হইতে দাতব্য ভাণ্ডারের সাহায্য দান করা হয়।





শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী ব্রহ্মনন্দিনী

[গৃহস্থ-বৈরাগ্য সাধন।]

কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠান।

এই সময়ে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কমলকুটীরে কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা-চন্দ্রের বিবাহ, মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বিবাহ এবং পারিবারিক ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা প্রধান। কোচবিহারের জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমারের জাতকর্ম্ম ও আটকৌড়ে যদিও "উড্‌ল্যাণ্ডস্" প্রাসাদে হয় তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

কোচবিহার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রের বিবাহও এক নূতন ব্যাপার। ব্রহ্মানন্দের নববিধানের সকলই নূতন। তাঁহার পরিবারও এক অভিনব পরিবার। তাই ভগবানের ইচ্ছাতেই এই পরি-বারের অনুষ্ঠানাদিও অনেক পরিমাণে নূতন।

আমাদের দেশে সচরাচর বিবাহে কন্যার অপেক্ষা বরই বয়সে বড় হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রের বিবাহে বরের অপেক্ষা কনেই বড় হইয়াছিল। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মোহিনী দেবীর সহিত করুণাচন্দ্রের বিবাহ হয়। মোহিনী

দেবী ভারতাশ্রমে থাকিয়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হন এবং নানাপ্রকার সদ্‌গুণান্বিতা ছিলেন। সতী জগন্মোহিনী দেবী মোহিনী দেবীকে শৈশবকাল হইতেই আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। করুণাচন্দ্রের বয়স মোহিনী দেবীর অপেক্ষা কিছু কম হইলেও উভয়ে পরস্পরকে মনোনয়ন করেন। যখন পাত্রপাত্রী স্বাধীনভাবে পরস্পরকে মনোনীত করেন, শ্রীব্রহ্মানন্দ তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন? তিনি অবশ্যই সম্মতি-দান করিলেন।

প্রথমতঃ লোকে নানা প্রকারে নিন্দাবাদ করাতে সতীর মনে কিছু আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর সম্মতি আছে জানিয়া তিনি আর সম্মতি দানে কুণ্ঠিত হইলেন না। এবং মহা সমারোহের সহিত ইং ১৮৮১ সালের ২২শে আগষ্ট এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ লইয়াও মণ্ডলী ও দেশমধ্যে মহা আন্দোলন হয়। শ্রীকেশব-চন্দ্র এবং সতীর বিরুদ্ধেও এজন্য বিরোধিগণ নানা কথা বলিয়া অযথা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই অর্থাৎ ইং ১৮৮১ সালের ১৩ই আগষ্ট তাঁহাদের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বিবাহ হয়। এ বিবাহেও শ্রীব্রহ্মানন্দের মহাবিশ্বাস ও

ঈশ্বর নির্ভরের পরিচয় পাওয়া যায়। সাবিত্রী দেবী বয়স্থা এবং বিবাহের উপযুক্তা হইলে ব্রহ্মানন্দ বিবাহ দিবার অর্থাদির আয়োজন এমন কি বরও ঠিক করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আশ্চর্য্য গণিত অনুসারে বিবাহের দিন একেবারে স্থির করেন।

প্রথমে কলিকাতাবাসী একজন শিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসে, কিন্তু যুবার পিতার মত নাই শুনিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সে প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হন। সেই সময়ে শ্রীব্রহ্মানন্দ বলেন "এক মেয়েকে কোচবিহারের মহারাজাকে দিয়াছি আর এ মেয়েকে এমন লোককে দিব তার ঘরবাড়ীও নাই।" মহারাজার জ্ঞাতিভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ তখনই বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী দিয়া আগমন করেন, সত্যই সে সময় তাঁহার ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না, তথাপি কোন যুবকের প্রস্তাবে তাঁহারই সহিত বিবাহ স্থির করেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতীর দেহাবস্থান কালে তাঁহাদের আর অন্য কোন ছেলে মেয়ের বিবাহ হয় নাই। সতী দেহে থাকিতে থাকিতে কেবল ময়ুরভঞ্জের শ্রীমৎ রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেবের সহিত তাঁর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী

সুচারু দেবীর বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হয় ইহাতে সতী উল্লসিত চিত্তে সকলকে বলেন "ভগবান আর একটী মহারাজকে আমার ঘরে আনিতেছেন।" কিন্তু বিধির চক্রে তাঁহার জীবদ্দশায় সে বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই, তবে ভক্তবৎসল ভগবানের অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এবং ভক্ত-কন্যার সীতার ন্যায় সতীত্ব প্রভাবে সে অপূর্ব্ব শ্রীরাম-লীলা পরে সংঘঠিত হয়।

কমলকুটীরের পারিবারিক ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাও এক উল্লেখ যোগ্য সুন্দর অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে সতী জগন্মোহিনী দেবী মোহিনী দেবীর সাহায্যে তাঁহাদের পারিবারিক ভাণ্ডার অতি সুন্দররূপে সাজাইয়া নূতন নূতন পাত্রে প্রত্যেক ভাণ্ডারের সামগ্রী রাখা হয়। পাত্রের গায়ে প্রত্যেক সামগ্রীর নামাঙ্কিত করিয়া যথা যথা স্থানে রক্ষিত হয় এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ দৈনিক উপাসনান্তে বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিয়া ইং ১৮৮১ সালের ২০শে নবেম্বর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভাণ্ডারের ভার সতী আপনার বধূ মাতা মোহিনী দেবীকেই অর্পণ করেন।

"হে পরম পিতা, হে মঙ্গলনিধান তুমি কোথায় থাক? তোমার বাসস্থান কোথায়? তোমাকে যখন য়িহুদীরাজ

মুষা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, তোমার নাম কি? তুমি বলিলে "আমি আছি" এই আমার নাম। যখন হিন্দু তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিলে "আমি গৃহলক্ষ্মী, সন্তানের গৃহে আমি থাকি।" তোমার নাম ধাম নাই, "তুমি আছ" এই তোমার নাম। ঠাকুর আছেন; ঠাকুর, পুত্রের বাড়ী থাকেন।

"দেবালয় বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে, তোমার যথার্থ ঘর মানুষের ঘর। তোমার সন্তানকে তুমি ঘর প্রস্তুত করিবার টাকা কড়ি দাও, ঘর প্রস্তুত হইলে সেখানে আসিয়া বাস কর।

"ঘরের লক্ষ্মীর জন্য বাহিরে গিয়া কে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে? তোমার মন্দির গৃহে, যেখানে সংসারের কার্য্য হয়; যেখানে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া সংসারের রীতি, নীতি, শৃঙ্খলা স্থাপিত করে।

"হে দয়াময়ি, আমাদের ঘর তোমার ঘর। কত নিকট হইলে তুমি। আকাশ ছাড়িলে কেন তুমি? বড় বড় মন্দির ছাড়িলে কেন? সেই যে সব গরীব দুঃখী গৃহস্থ তার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া। পুত্রবৎসলা কন্যাবৎসলা তুমি। তুমি আকাশ লইয়া কি করিবে? ছেলে কাঁদিলে যাঁর স্তনে ঝর ঝর করিয়া দুগ্ধ আসে, তাঁর কি আকাশ

লইয়া পোষায়? সে জন্য তুমি বলিলে, লক্ষ্মী প্রেম প্রকাশ হবার মন্দির হউক মনুষ্যের গৃহ।

"মানুষ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন, মানুষের সন্তান হইল অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। মানুষ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। লক্ষ্মী আসিয়া শিশু পালন করেন। মা, তোমার স্বতন্ত্র ঘর হইল না। * * মার বাড়ী কোথায়? সব ছেলেদের গৃহদ্বার খুলিয়া গেল, অমনি দেখা গেল মা লক্ষ্মী বসে আছেন। জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয়, লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনি হইয়া পৃথিবীতে লক্ষ্মীর আগমন ঘোষণা হইল।

"লক্ষ্মীকে আর কোথাও পাওয়া যায় না, কেবল সেবা করিতে লাগিলে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আজ বলিলেন তীর্থ হইতে আসিয়া মা লক্ষ্মী গৃহস্থের সংসারে বসিয়াছেন। যেখানে গৃহের কার্য্য হইতেছে মা সেখানে তুমি।

"আশ্চর্য্য প্রেম তোমার! ভোর হইতে না হইতে লক্ষ্মী ছেলের সংসার গুছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। তুমি চারিদিকে ঘুরিতেছ কার সাধ্য অকল্যাণ করে? তুমি ছুঁইয়া এই সব শুদ্ধ কর।"—(দৈঃ প্রার্থনা ২য় ভাগ।)

কোচবিহার মহারাজ মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ মহারাজ-কুমারের জাতকর্ম্ম ও "আটকৌড়ে" অনুষ্ঠানও এই সময় বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। মহারাজের আলীপুরস্থ "উড্‌লাণ্ডস্" নামক প্রাসাদেই মহারাজ-কুমারের জন্ম হয়। মহারাণীর প্রথম পুত্র কোচবিহারের ভাবী মহারাজের জন্মব্যাপার শ্রীব্রহ্মানন্দ কখনই সাধারণ ভাবে দেখেন নাই। তাই এই জন্মব্যাপারে তিনি মহোল্লাস সহকারে নিজেই শঙ্খ-বাদন করেন। রাজপরিবারের প্রথম অনুষ্ঠান নবধর্ম্ম অনুসারে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী দেবী বিশেষ উদ্যোগ করেন এবং এই স্বাধীন রাজ-পরিবারের উপযোগী আড়ম্বরের সহিত ইহা সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলী এবং অন্যান্য মণ্ডলী মধ্যে যথেষ্টই রজত তৈজস ও অন্যান্য উপঢৌকনাদি বিতরিত হয়, নানাপ্রকার দাতব্য অনুষ্ঠানাদিতে ও দীন দরিদ্রদের মধ্যেও বহু অর্থ দানের সুব্যবস্থা করা হয়।



সতীদেবীর সংসার সাধন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সতীকে উপদেশ দেন "আমাদের সংসার যেন ধর্ম্মের সংসার হয়।" সতী ব্রহ্মানন্দিনীও বরাবর সেই উপদেশ অনুসারেই সংসার সাধন করিতে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দিনীর সংসার প্রত্যক্ষ ভগবানেরই সংসার। এ সংসারের কর্ত্তা যিনি তিনিও কখনও কর্ত্তৃত্ব করিতেন না, গিন্নি যিনি তাঁহারও কর্ত্তৃত্ব চলিত না।

কলুটোলার বাটীতে প্রথম প্রথম ত তাঁহারা লোকে যেমন কথায় বলে "দাদার ভাতেই" ছিলেন, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনেই থাকিতেন; তাহার পর প্রেরিত অভিভাবক শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ই বরাবর অভিভাবকরূপে সমুদয় সংসারের বন্দোবস্ত করিতেন। সুতরাং গৃহিণী দেবীকে কান্তি বাবুরই ব্যবস্থাধীনে সংসার চালাইতে হইত। ছেলে মেয়েদের যখন যাহা দরকার হইত তাহারা বাবা মার কাছে প্রায় না চাহিয়া "কাকা বাবুর" অর্থাৎ কান্তি বাবুর কাছেই চাহিত।



শ্রীকেশবচন্দ্র ও সতী জগন্মোহিনা দেবী সন্তানগণ সনে।

সতী যদি কখনও কিছু অভাবের কথা স্বামীকে বলিতেন, তিনি ত হুঁ হাঁ করিয়াই সারিয়া দিতেন; যেমন সতী যদি বলিতেন "সুনীতির যে কাপড় নাই," ব্রহ্মানন্দ উত্তর দিতেন "নাই?" তার পর আর কি হইবে না হইবে কিছুই বলিতেন না। অগত্যা সতীকে হয় কান্তি বাবুকে বলিতে হইত, নয় কান্তি বাবু যতক্ষণ না আনিয়া দিতেন অপেক্ষা করিতে হইত।

আশ্চর্য্য বিধাতার বিধান, যথেষ্ট ধনাঢ্য পরিবার হইলেও বরাবরই ব্রহ্মানন্দের সংসার কিন্তু "অদ্য অন্ন-ধনুর্গুণঃ" ভাবে বৈরাগ্যের সংসার রূপেই চলিয়াছে।

কখনও কখনও কান্তি বাবু ব্যয়াধিক্য বশতঃ ঋণ করিতেন বলিয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ তাহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতেন। এবং তাঁহারই অনুমোদনে অন্য দুএকজনও মাঝে মাঝে সংসারের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন। একবার শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসু ও একবার ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখ কয়েকজন সাধক ভারগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই অধিক দিন এ ভার লইয়া রাখিতে পারেন নাই।

একবার স্বর্গীয় বিধান-বিশ্বাসী পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু এ সংসারের ব্যয়াধিক্য

কমাইবার ভার লইতে চান। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে স্বাধীনতা-প্রিয় শ্রীব্রহ্মানন্দ কখনই তাঁহাকে বাধা দিতেন না, সুতরাং কালীনাথ বাবুর প্রস্তাবে তিনি তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু সেই দিনই কেশবচন্দ্র বাজারে গিয়া প্রায় ১০।১২ টাকার পাখী কিনিয়া আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পাখীকে পড়াইতে লাগিলেন—

"আয়রে চড়াই খাওরে কড়াই,
আপন বুদ্ধিতে যে করে বড়াই,
তার গালে খুব করে চড়াই,
পাখী তুমি ভাবনা বিমুখ, তোমার মনে কতই সুখ,
প্রাণের চড়াই, এই ভিক্ষা চাই,
(যেন) তোমার হরির চরণ জড়াই।"

কালীনাথ বাবু ইহা দেখিয়াই অবাক্। যাঁহার সংসারের ন্যায্য ব্যয়ই চলা ভার—তিনি এত টাকা খরচ করিয়া পাখী কিনিয়া আনিলেন দেখিয়া এ সংসারের ব্যয় কমান তাঁর কর্ম্ম নয় এই বলিয়া সে ভার তখনই ত্যাগ করিলেন। ঈশার বৈরাগ্যের উপদেশ সাধন জন্য যে শ্রীব্রহ্মানন্দ এত ব্যয় করিয়া পাখী কিনিয়া আনিলেন, কালীনাথ বাবু বোধ হয় ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারিলেন

না। যাহাহউক কেশবচন্দ্র একদিকে যেমন বৈরাগী, তেমনি অন্যদিকে ঘোর সংসারী ; কেননা কেবল ধর্ম্মার্থেই তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রভুর সংসারের সমুদয় কার্য্য প্রভুর কার্য্য জানিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য যে ভাবে তাহার প্রত্যেক খুটীনাটী পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পাদন করেন, শ্রীব্রহ্মানন্দও ঠিক সেই ভাবে সংসার করিতেন। এবং সতী দেবীকেও স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া এই ভাব সাধন করিতে হইত।

এজন্য যিনি যখনই সংসারের ভার লউন এ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভুগিবার তাহা সতীকেই ভুগিতে হইত। প্রথমতঃ অর্থের অনটন চিরদিনই সমান, কল্যকার জন্য চিন্তা না করা যে সংসারের নির্দ্দিষ্ট বিধি সে সংসারে অর্থাদির স্বচ্ছলতা থাকিবে কেন? সুতরাং ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় অভাবাদিও অনেক সময়ই মোচন হইত না এবং তাহা না হইলে যে মার প্রাণে নিতান্তই আঘাত লাগিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শুনিতে পাই এজন্য কখনও কখনও কান্তি বাবুর সহিত সতীর বাদানুবাদও হইত। ইহাতে এক এক সময় কান্তি বাবু মহাশয় রাগ করিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়িতেন না, কিন্তু আমরা কান্তি

বাবুর মুখেই শুনিয়াছি এরকম বাকবিতণ্ডার সময়ও সতীর হাস্যমুখ কখনও মলিন হইত না। ধন্য তাঁহার সহিষ্ণুতা ও শান্তচিত্ততা।

এই সময়ে সতী জগন্মোহিনী দেবী কি ভাবে সংসার-ধর্ম্ম সাধন করেন, তাহার কিছু কিছু আখ্যায়িকা এই খানেই উল্লেখ করিব।

স্বামী আহার না করিলে সতী কখনই আহার করিতেন না। স্বামীর পাতের প্রসাদ ভোজন তাঁহার নৈমিত্তিক সাধনের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁহার আহার করিতে কখনই প্রায় দুইটা তিনটার কম হইত না; কেন না ব্রহ্মানন্দের দৈনিক উপাসনা করিতে প্রায় ১২টা বাজিত, কখনও কখনও তাহারও অধিক হইত; তাহার পর আচার্য্যদেব প্রায়ই স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কাজেই এই রন্ধনের পর আহার করিতে ব্রহ্মানন্দেরই প্রায় ২টা বাজিয়া যাইত, সুতরাং তাহার পর আহার করিতে প্রতিদিনই সতীর তিনটা বাজিত। ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে রন্ধন করিলেও সতীও তাঁহার জন্য কিছু কিছু তরকারী রাঁধিতেন।

আবার ধর্ম্মের সংসারে অতিথি অভ্যাগত প্রায়ই আসিতেন; এমন কি অনেক সময় সতী আহার করিতে

যাইতেছেন, এমন সময় হয় ত পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন ব্যক্তি সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাজেই তাঁহাদের আহার না করাইয়া আর সতী আহার করিতে পাইতেন না, অনেক দিন তাঁহার নিজের অন্নও অন্যকে দিয়া পরে হয় রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতেন, নয় অর্থাভাব থাকিলে অনাহার বা অল্লাহারেও কাটাইতেন। তিনি প্রতিদিনই প্রায় হাঁড়ীতে বেশী করিয়া চাল দিতেন, কি জানি কোন্ দিন কোন্ অভুক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন। উচ্চ গৃহস্থের ধর্ম্মসাধনের এমন উজ্জ্বল সুন্দর দৃষ্টান্ত বিশেষতঃ স্বার্থপর কলিকাতা সহরে ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে যে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ বিবাহের পর সমাজের অনেকে ভাবিত, বধূর তেমন আদর যত্ন নাই, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা বধূকে সকলে কষ্ট দেয়। ইহা যে কত ভুল, তাহা বধূ মোহিনী দেবীর নিম্নোদ্ধৃত ও অন্যান্য পত্রাদি পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন।

মোহিনী দেবী সতীর কোন কন্যাকে এইরূপ এক পত্র লেখেন, "মাতা ঠাকুরাণীর চরণে আমার শত

প্রণাম বলিও। তাঁর আশীর্ব্বাদ ও রোগশয্যায় তাঁর মাতৃস্নেহ, মাতার তুল্য যত্নের কথা অনেক সময় ভাবি। তাঁহাকে আমি কেবল শ্বাশুড়ী জ্ঞান করি না; আমি যখন সেই ছেলেবেলা তাঁর কাছে থাকিতে ভালবাসিতাম, তিনি আদর করিয়া হাতে খাবার দিতেন, সঙ্গে লইয়া গান করিতেন, আশ্রমে পাশে বসাইয়া ভাত খাওয়াইতেন, সেই সম্বন্ধেই সেই চক্ষেই অধিক সময় তাঁহাকে দেখি। যদিও কত সময় ঠিক ব্যবহার করিতে পারি না। কিন্তু তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ বিশ্বাস করি। ভক্ত যে আমার বালিকাবয়সের অবিভাবক, পিতা, গুরু সবই। * * *"

যাহাহউক বাল্যকাল হইতে মোহিনী দেবীকে আচার্য্যদেব ও দেবী জগন্মোহিনী অতিশয় স্নেহ করিতেন। বেলঘরিয়া বাগানের আশ্রমে মোহিনী দেবী থাকিতেন। এমন কি দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ভাবিতেন "মোহিনী দিদি মার বড় মেয়ে, তাই মা সকলের চেয়ে মোহিনী দিদিকে ভালবাসেন।" বধূকে সতী চিরদিনই কন্যার মত স্নেহ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সতী আকুল ক্রন্দন করিয়া বলেন "তুমি আমার আগে গেলে কেন, তোমার হাতে যে সব দিয়ে যাবো ভেবেছিলাম।"

শেষ সময়ে দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বেও "বধূর" নাম করিয়াছেন। আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিয়া বধূর হাতে ভাণ্ডারের চাবি দিয়াছিলেন।

সতীদেবী কন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবনই সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষার স্থল ছিল। তিনি সর্ব্বদা সন্তানদের কিসে যথার্থ কল্যাণ হইবে ইহাই চিন্তা করিতেন। তিনি ছেলে মেয়েদের বড়-মানুষী চাল চলন ভালবাসিতেন না। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন। অবগুণ্ঠনই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি অস্থিরতা ভালবাসিতেন না, মিতব্যয়িতা ভাল বাসিতেন। দান তাঁহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল। তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন। দেবীর নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া কেহ প্রায় রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, দুঃখী লোককে সর্ব্বদা মিষ্টকথায় তুষ্ট করিতেন ও সকলেরই অভাবমোচন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলা ছিলেন; দেখা গিয়াছে সম্মুখে কোনও প্রতিবাসী তাঁহাকে অযথা কথা বলিয়াছে, তথাপি তিনি তাঁর হৃদয়ের স্নেহক্ষমা দানে সকল কথা ভুলিয়া যাইতেন। আপন শ্বশ্রু ঠাকুরাণী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভক্তি ছিল।

তিনি আচার্য্য মাতাকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে দর্শন করিতেন, এবং কিছুদিন ব্রত লইয়া তাঁহার পদপূজা করিয়া তাঁহাকে আহার করাইয়া তবে নিজে অন্নজল গ্রহণ করিতেন। আচার্য্যদেবের ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকেও আপন ভাই ভগ্নীর ন্যায় আদর স্নেহ করিতেন।

কোনরূপ বস্ত্রালঙ্কার কি বেশভূষায় দেবীর কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। কিন্তু মলিন বস্ত্রাদি তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। অল্প মূল্যের হউক, কিন্তু পুত্র কন্যাগণ পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। দেবীর আচার ব্যবহার অতি পবিত্র ছিল। ঘর দ্বার পরিষ্কার দেখিতে সদাই ভালবাসিতেন। সন্তানগণ প্রতিদিন স্নান করিত। লজ্জাপ্রিয়া দেবী, কন্যাদিগকে লজ্জাবতী হইতে সদা সদুপদেশ দিতেন।

একসময়ে স্নেহময়ী দেবী জগন্মোহিনী সন্তান-বৎসলা কন্যার কঠিন রোগের সময় কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। কন্যা বলিল, "মা একটু প্রসাদ দাও," তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, চিকিৎসক পর্য্যন্ত আশা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর ভগবানে একান্ত নির্ভর-শীলতার কথা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন

সকল ভরসা গেল, তিনি একান্তমনে মঙ্গলময়ের চরণে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁর বিশ্বাস বলেই যেন সকল বিপদ অনায়াসে কাটিয়া গেল।

আর এক সময়ে তাঁর কন্যার একটী পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। চিকিৎসকেরা আশা ছাড়িয়া দিল। পুত্রের মাতার শরীর অসুস্থ, সেই পুত্রের চিন্তায় অস্থির দেখিয়া স্নেহময়ী জননী বলিলেন, "কেন অত ভাবিতেছ; যিনি দিয়াছেন তিনি রাখেন থাকিবে, ইচ্ছা হয় লইবেন, অত ভাবিয়া কি করিবে?" এইরূপ কথা কি সহজে কেহ বলিতে পারে? যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় নির্ভর আছে, তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারেন?

দেবী কন্যাদিগকে সর্ব্বদা শিশুসন্তানের প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। তাহাদিগের খাওয়া দাওয়ার কোনরূপ বিশৃঙ্খলা কিম্বা অসাবধানতা দেখিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। এক সময় তাঁর একটী কন্যার সূতিকাগারে সন্তান-শোক হয়। তিনি সে সময় পর্ব্বতে ছিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং পথে সমস্তক্ষণ কন্যার ক্রন্দনধ্বনি তাঁর কর্ণে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল মনে করেন। সেই অপত্য স্নেহে বিগলিতা জননী

আসিয়া কন্যাকে শোকাতুরা দেখিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তার কিছু দিন পরে সর্ব্বদাই কন্যাকে শোকে কাতর দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার তৈয়ারী ছেলেগুলির প্রতি দৃষ্টি করিছ না? এগুলিকে ভগবান্ দেখিতে বলিয়াছেন, একটীর জন্য অত কাতর হইলে চলিবে কেন?" মাতার সুমিষ্ট ভর্ৎসনায় কন্যার চৈতন্য হইল। সত্যই ত, এ সবই ত তাঁর দেওয়া, যাহাকে তাঁর ইচ্ছা হইল তাহাকেই লইলেন, এই বলিয়া কন্যা মনকে শান্ত করিলেন।

এইরূপ অন্যেরা অত্যন্ত দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেও, তাঁহার বিশ্বাস তিলমাত্র টলিত না। সে বিশ্বাস অটল স্থির থাকিত। অনেক সময় তাঁহার প্রার্থনার বলে তাঁহার আত্মীয়গণের ভয়ঙ্কর দুঃখ বিপদ বিদূরিত হইত। সন্তানগণের কত রকম রোগের যন্ত্রণা কষ্টই স্নেহময়ী জননী একাকী সহ্য কবিয়াছেন। সত্যই তিনি যেন সন্তানগণের বল ছিলেন।

দেবী সময়ে সময়ে অতি উচ্চ ব্রত সকল লইতেন। এক সময়ে আচার্য্যদেব কোন উপলক্ষে সতীকে বলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ (nun) ভগ্নীদের মত মাথায় শ্বেত বস্ত্র বাঁধিয়া তাহার উপর কাপড় বাঁধিয়া মন্দিরে যাইলে

হয়, তিনি তাহাই করিতেন। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কঠিন ব্রত সকল পালন করিতেন। বিলাস বাসনা তাঁহার একেবারেই ছিল না।

আচার্য্যদেব কোন সময়ে বলিয়াছিলেন "মেয়ে মানুষদের চুলের প্রতি আসক্তি দেখা যায়। তুমি কি চুল কাটিতে পার?" পতিপ্রাণা ধর্ম্মশীলা সতীদেবী তখন সে কথায় যেন তত মনোযোগ দিলেন না বোধ হইল, কিন্তু সেই কথাটী তাঁহার হৃদয়ে একেবারে বিদ্ধ হইয়া রহিল। একদিন উপাসনা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিলেন, এবং একখানি ছোট কাঁচি বাহির করিয়া মস্তকের সমুদয় চুলগুলি ছোট বড় করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সেখানে তাঁর একটী কন্যা উপস্থিত ছিলেন; কন্যা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। সে সময় তাঁহার মুখের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। সে এক স্বর্গীয় ভাব। পরে সেই চুলগুলি ডালি সাজাইয়া উপাসনা গৃহে অর্পণ করেন।

এইরূপে মাঝে মাঝে আচার্য্যদেবের প্রবর্ত্তনায় বা তাঁহার অনুমতি লইয়া কতই ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। বেলঘরিয়ার বাগানে সতী "মৈত্রেয়ী ব্রত" গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত শুদ্ধাচারা ছিলেন। গৈরিক বসন পরিধান

করিয়া তিনি যখন দেবালয়ে যাইতেন ঠিক যেন স্বর্গীয় দেবভাবপূর্ণ দেবী অবতীর্ণ হইয়াছেন মনে হইত।

দেবী প্রতি সোমবারেই আর্য্যনারীগণকে লইয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। তিনি বিনা চেষ্টায় কতই সঙ্গীত রচনা করিতেন, এই নিমিত্ত কোন প্রচারক তাঁহাকে "ভাবুক" নাম দিয়াছিলেন।

সতীদেবী দুর্নীতি পাপ একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। নিজের যেমন সতীত্বের তেজ ছিল, কোন প্রকার পাপ তাঁর চক্ষুশূল হইত।

আধুনিক সমাজের পুরুষ ও নারীজাতির মুক্তভাবে কথোপকথন, অধিককাল একত্র গল্প করা, সতী অতিশয় অপছন্দ করিতেন। অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ কাজ, মন্দ চরিত্র স্ত্রীলোক কিম্বা দাস দাসীকে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। বাড়ীতে কোনরূপ অন্যায় আচরণ যাহাতে না হয়, সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁর সতীত্বের তেজ চারিদিক পবিত্র রাখিত।

সতী সদাই হাসিতে ভালবাসিতেন, এমন কি মাঝে মাঝে কোন প্রচারক পত্নীর সহিত বসিয়া এতই হাসিতেন, যে কোন কোন বৃদ্ধা তাঁহাদের তিরস্কার করিয়া বলিতেন,

"মেয়ে মানুষের আবার এত হাসি কেন?" এই কথা সতী শুনিয়া একদিন ছড়া করিয়া গাহিলেন, "মা, হাসিতে হাসিতে ডাকিব তোমায়, করিব না আমরা লোকের ভয়।"

মেয়েদের সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্য সতীর একটী ক্ষুদ্র যোগের ঘর ছিল। সেখানে সকলকে আরাধনার এক একটী স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে "মঙ্গলস্বরূপ", মধ্যমা কন্যাকে "শুদ্ধস্বরূপ", এইরূপ সকলকে এক একটী ভার দিয়াছিলেন।

দেবালয়ে বসিয়া তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত ফুলের পাতা দিয়া ভগবানের নাম, গান লিখিতেন, এবং আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া চিত্র বিচিত্র আঁকিতেন। মাঝে মাঝে অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতেন। বিশেষতঃ সাধুদের চিত্র অতি সুন্দর চিত্রিত করিতেন। এক সময়ে শ্রীআচার্য্যদেবের এমনই সুন্দর মূর্ত্তি পত্রে অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে সে চিত্র দেখিয়া সকলে ভাবিল কোন সুনিপুণ চিত্রকর ভিন্ন এ চিত্র কেহ আঁকিতে পারে না।

দেবীর সন্তান বাৎসল্য যেমন প্রতিবেশী-প্রিয়তাও তদ্রূপ ছিল। এক সময়ে তিনি শুনিলেন প্রতিবেশিনী-

গণের অন্নাভাবে আহার হয় নাই। সেই রাত্রেই সমুদয় অন্ন স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়া সকলকে আহার করাইলেন।

যদি কখন দুই পক্ষে বিবাদ বিসংবাদ হইত, দেবী কোন পক্ষ সমর্থন করিতেন না; উভয়ের মধ্যে শান্তি সংস্থাপনেরই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

মঙ্গলপাড়ায় দুইটী প্রতিবেশিনীতে একবার ঘোরতর কলহ হইয়াছিল। এমন কি কুৎসিত গালি সকল পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই তুমুল কলহ বিবাদে পাড়ার সকলেই অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কেহই কোন উপায় করিতে পারিলেন না। ক্রমে সেই কথা পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের কর্ণে উঠিল। শেষে দেবী জগন্মোহিনীরও তাহা শুনিতে বাকি রহিল না। সামান্যা নারীরা সে সকল কুৎসিত কথা শুনিলে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার উদার ক্ষমাগুণে তাহা সহ্য করিলেন ও আচার্য্যদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করা উচিত বল দেখি?" আচার্য্যদেব বলিলেন, "ইহাদের লইয়া উপাসনা করা উচিত।" কোমলহৃদয়া দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিয়াছি।" এই কথা বলিয়া দেবী মঙ্গলপাড়ায় চলিলেন।

তাঁহার কন্যাগণও মা কোথায় যাইতেছেন, কি একটা আমোদ ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মঙ্গল-পাড়ায় একটী ক্ষুদ্র গৃহে দেবী অন্য সকল প্রতি-বেশিনী ও কন্যাগণে বেষ্টিতা হইয়া বসিলেন ও এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহিনী প্রার্থনা করিলেন যে, সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন সেই গানটী হইল, "কেন হওরে বিষাদিত; জেনে শুনে আর কেন বার বার এই নির্ম্মল জীবন পাপে কর কলঙ্কিত।" দেবীর প্রার্থনা শুনিয়া অনেকের চক্ষে জল পড়িল। দুই বিরোধী নারীর মধ্যে একজন প্রার্থনাও করিলেন। পরে উপাসনা হইতে উঠিয়া দুই জনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুই জনের মধ্যে উপাসনার পূর্ব্বে যে ভয়ঙ্কর বিবাদ ছিল, দেবীর মহদ্‌গুণে সেই শত্রুভাব চলিয়া গেল। ধন্য সতী দেবি, এইরূপ শান্তিস্থাপকদিগেরই ত স্বর্গরাজ্য।

আর এক সময়ে দেবীর কোন একটী বন্ধু তাঁহার স্বামী বিয়োগের পর দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেদিন আর্য্যনারী সমাজের উপাসনা ছিল। তাঁহাকে লইয়া দেবী উপাসনা করিলেন, সেই বন্ধুর দুঃখে এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। দেবী একটী নূতন সঙ্গীতও রচনা করিলেন, "কেন

রে তোর কাঙ্গালিনী বেশ; কি দুঃখে হ'য়ে দুঃখিনী, বাছা, ধ'রেছ মলিন বেশ"। পর-দুঃখে-কাতরা দেবী কাহারও কষ্ট দেখিলে এইরূপে নিতান্তই কাতর হইতেন।

দেবীর কনিষ্ঠপুত্র সুব্রতচন্দ্র যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন আচার্য্যদেব উপাসনা করিতেছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর শঙ্খধ্বনি হইল। আচার্য্যদেব অতি সুমিষ্ট "জাতকর্ম্ম" বলিয়া ৭ই নভেম্বর একটী প্রার্থনা করেন। তিনি সেই কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম উপলক্ষে সেই সন্তানকে বলিয়াছিলেন, এই পুত্রের "যোগ ও ভক্তি হইবে", কেন না "অনন্ত স্বরূপের শেষ ও প্রেমস্বরূপের আরম্ভে ইহার জন্ম হয়।" তাঁহার সংসার সম্বন্ধে প্রত্যেক কার্য্য ও ভাব ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

এক সময়ে দেবী, কন্যাগণ ও সঙ্গিনীগণ সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলে মিলিয়া উপাসনা, আহারাদি করিয়া, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কুল কুড়াইয়া গান করিয়াছিলেন "কুল খেয়ে কূল পাব ব'লে তাই কুল খাই।"

তিনি অতি সুন্দররূপে জলে সন্তরণ করিতে পারিতেন। এক সময় কাঁকুড়গাছির বাগানে আচার্য্য-দেবকে চাবি পাঠাইয়া দিয়া "আমি যদি না ফিরি" বলিয়া

সন্তরণ করিতে যান। শেষে সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে গিয়া হস্ত অবশ হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে সঙ্গিনীর স্কন্ধে ভার দিয়া পার হইয়া আসিলেন।

দেবী জগন্মোহিনীকে সাংসারিক বিষয়ে ত যথেষ্টই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু সংসারে তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। বাস্তবিক তাঁর অনাসক্ত ভাব দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। তাঁহার গহনাদি হারাইলে অনেক সময় অন্য লোকে তাঁর অসাবধানতার জন্য আচার্য্যদেবের নিকটে অনুযোগ করিত, কিন্তু তাহাতে একবার তিনি এইরূপে উত্তর করিয়াছিলেন, "জান না ইঁহার কত অনাসক্ত জীবন? অন্য স্ত্রীর ৫০০ শত টাকার গহনা হারাইলে হয়ত সে পাগল হইয়া যাইত, কিন্তু ইঁহার তাহাতে মনে কিছুই হইল না।"

দেবী রোগের যন্ত্রণায় অনেক সময় কষ্ট পাইয়াছেন। এক সময় তাঁর চক্ষের পীড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হয়, কিন্তু তিনি সেই অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও ভগবানের চরণে প্রতিদিন একাগ্রমনে উপাসনা করিতেন।

এইরূপে দেবী কমলকুটীরে কত ভাবেই সংসার-ধর্ম্মসাধনের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপন জীবনের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

যুগল-ব্রত সাধন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ "যুগলরূপ সাধন" শীর্ষক প্রার্থনায় বলেনঃ—

"বিশ বৎসরের ধর্ম্মের খেলাতে বুঝিলাম ধর্ম্মসাধন পূর্ণ হয় না যতক্ষণ স্ত্রীপুরুষে দুইজনে মিলিত না হয়।

"ঈশ্বর, তুমি যাহাদের বাঁধিয়াছ, যে দম্পতি তোমার কাছে একসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে সাধ্য কি পৃথিবী তাহাদিগকে ভিন্ন করে?

"সকলে সংসার তীর্থের ভিতর ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অমর ফল সঞ্চয় কর। দুই না হইয়া এক হও।

"সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে আপন আপন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া ধর্ম্মসাধন করিবেন, এই আজ্ঞা আসিয়াছে।"—("যুগলরূপ সাধন"। দৈঃ ৭ম, ৭)

কার্য্যতঃ এই আজ্ঞা শ্রীব্রহ্মানন্দ বরাবরই পালন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যুগল-ব্রত তাঁহার এই সাধনের চরম দৃষ্টান্ত।

সতী জগন্মোহিনী দেবীরও মহজ্জীবনের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি ভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ সনে এই যুগল-ব্রত সাধন। ইহা তাঁহার সতীত্বেরও পরাকাষ্ঠা। কেন না এই



শ্রীব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মনন্দিনী

[যুগল-সাধন।]

ব্রত সাধনাতেই দুইজনে অধ্যাত্মযোগে সত্যই "একজন" হইয়া গেলেন, এবং সৎপতির যথার্থ "সহধর্ম্মিণী" হইয়া ব্রহ্মনন্দিনী বর্ত্তমান যুগে "সতীত্বের" পূর্ণাদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

আমাদের দেশে যাঁহারা স্বামিসঙ্গে সহমৃতা হইতেন, তাঁহারাই "সতী" নামে পরিচিতা। পূর্ব্বে প্রকৃত স্বামিভক্তিপরায়ণা নারীগণ স্বামিবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সতীত্ব ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ স্বামী-চিতায় আত্মহত্যা করিতেন, এই জন্যই তাঁহারা "সতী" বলিয়া পরিচিতা হইতেন; কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের দেখাদেখি বা লোক দেখাইবার জন্য স্বামীভক্তি না থাকিলেও কিম্বা পরিণামে বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালনের ভয়ে অনেকে এই সতীত্বের "আগুন খাইতে" আরম্ভ করে, এবং ইহা ক্রমে যে কেবল একটা দেশাচার বা দেশের কুপ্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা নহে, আত্মীয় স্বজনেরা নারীদের নিজ অনিচ্ছা সত্বেও জোর করিয়া স্বামীর চিতায় ফেলিয়া, তাহাদিগকে পুড়াইয়া মারিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে রাজবিধি

অনুসারে এই প্রকার "সতী" কুপ্রথা নিবারণ করেন, কিন্তু শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানের নববিধি অনুসারে সতী জগন্মোহিনী দেবীর সহায়তায় বর্ত্তমান যুগে আবার নব-সতী-প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বে স্বামী দেহত্যাগ করিলে, যিনি তাঁহার সহিত দেহত্যাগ করিতেন তিনিই "সতী" হইতেন। নববিধানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদেহেই যখন দেহত্যাগী বৈরাগী ও আত্মস্থ আত্মক্রীড় অধ্যাত্ম-জীবনধারী হইলেন, সতী জগন্মোহিনী দেবীও তাঁহার অনুগামিনী হইতে স্বীকৃতা হইয়া উভয়ে যে আধ্যাত্মিক উদ্বাহব্রত বা যুগল সাধন ব্রত গ্রহণ করেন, ইহাতেই নবযুগে নব-সতী-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং জগন্মোহিনী দেবীই এযুগে সতী-জীবনের যথার্থ আদর্শ দেখাইলেন। পূর্ব্বকার সতী-প্রথা প্রকৃতই বীভৎস কুপ্রথা ছিল, কিন্তু নববিধানের এই নব সতী-প্রথাই যথার্থ ধর্ম্মসমন্বিত সতী-প্রথা। কারণ স্বামীর "সহধর্ম্মিণী" যিনি, তিনিইত সতী।

আত্মায় আত্মায় বিবাহই যথার্থ একাত্মতা মিলন, ইহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, শরীরের বিবাহ কেবল তাহারই সূচনা মাত্র। পার্থিব দেহের বিবাহ যখন আধ্যাত্মিক বিবাহে পরিণত হয়, তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য

যথার্থ পূর্ণ হয়। সতী জগন্মোহিনী দেবী ব্রহ্মানন্দ-সনে বিবাহকাল হইতেই অন্তরে যে গভীর স্বামিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত আমরা যথেষ্টই দেখাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তথাপি বাহ্যতঃ কোন কোন সময়ে তাঁর যেন কতকটা ভিন্নভাব লক্ষিতও হইত।

স্বামীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধ বা সাংসারিক সম্বন্ধই স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের প্রধান সম্বন্ধ, ইহাই ত অনেকের চিরসংস্কার। কিন্তু সে সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়াও সম্পূর্ণ-রূপে অদৈহিক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে স্বামী সহ উদ্বাহিত হইয়া, ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন "বৈরাগ্য-শ্মশানে" বাস করা, ইহা স্বামীর সহিত যথার্থ সহমরণ ভিন্ন আর কি? ইহা সহ-মরণ অপেক্ষা সহ-মরণে সহ-নবজীবন বলাই ঠিক।

এই যে জগন্মোহিনী দেবী সকল ভিন্নভাব ত্যাগ করিয়া স্বামীসহ যুগল-ব্রতধারিণী হইলেন বা তাঁহার সহিত সহ-মরণে সহ-নবজীবন পাইলেন, ইহাতেই কি তিনি নব-বিধানের নব-সতীপ্রথা নিজ জীবন দ্বারা প্রবর্ত্তন করিলেন না? এবং ইহা দ্বারা তিনি যে যথার্থ "সতী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এই জন্যই শ্রীব্রহ্মানন্দ

তাঁহাকে "সতী" অভিধানে আখ্যাত করিয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীব্রহ্মানন্দ অগ্রে নিজজীবনে যাহা না সাধন করিতেন, কখনই তাহা মতে প্রচার বা শিক্ষা দিতেন না। তাই ব্রহ্মানন্দ ও জগন্মোহিনী দেবীর আধ্যাত্মিক উদ্বাহ-ব্রত বা যুগল-সাধন ব্রত গ্রহণের পরে যে নবসংহিতা রচিত হয়, তাহাতে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ সম্বন্ধে যে বিধি ব্রহ্মানন্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই ব্রতের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ আমরা এই খানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কারণ ইহাতেই এই মহাব্রতের উচ্চভাব অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নবসংহিতায় শ্রীব্রহ্মানন্দ বলেনঃ—

"যখন স্বামী ও স্ত্রী পবিত্রতর সখ্যবন্ধন জন্য পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত ও আহূত হন তখন তাঁহারা সেই আহ্বানের অনুবর্ত্তী হইবেন এবং স্বর্গধামের উদ্বাহ অনুষ্ঠানের জন্য তৎক্ষণাৎ আয়োজন করিবেন।

"কারণ তাঁহাদের প্রথম বিবাহ অসম্পূর্ণ এবং কেবল আংশিক মাত্র, এক্ষণে তাঁহাদের মিলন সর্ব্বাঙ্গীন হইবে।

"এত দিন তাঁহারা উভয়ে উভয়ের নিকট পৃথিবীর সহচর ছিলেন, এক্ষণে পরস্পর স্বর্গধামের সহচর হইবেন।

"কারণ বিবাহ কিসের নিমিত্ত? ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনুষ্য বলে, বংশরক্ষা এবং পৃথিবীর স্বার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য।

"স্বর্গের সংহিতা বলে, তাহা নহে; স্বামী স্ত্রীকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য শিক্ষা দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য।

"অতএব বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ পুনরায় পরস্পরকে বিরাহ করুক, তাহাতে তাঁহাদের পৃথিবীর বন্ধুতা স্বর্গের আধ্যাত্মিকযোগে পরিণত হইবে।

"চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে এইরূপ দ্বিতীয় বিবাহ বা আধ্যাত্মিক বিবাহের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল সময়।

"জীবনের ভার সকল বহন করা হইল, তাহার প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদিত হইল, গৃহস্থালীর কার্য্যপ্রণালী সকল ব্যবস্থাপিত হইল, পৃথিবীর সুখ দুঃখভোগ করা হইল, এবং পার্থিব দাম্পত্য-জীবন যথেষ্ট পরিমাণে যাপিত হইল।

"এক্ষণে তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ অধিকার, কর্ত্তব্য এবং আনন্দ বিষয়ে চিন্তা করুন।

"উপযুক্ত আয়োজনের জন্য তিন দিবস আত্ম-পরীক্ষা, ধ্যান, শাস্ত্র-পাঠ, সংযম ও সমবেত প্রার্থনাতে নিয়োগ করিবেন।

"চতুর্থ দিবসে স্বামী এবং স্ত্রী স্নান করিয়া নূতন গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিবেন এবং দেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনায় উপস্থিত হইবেন।

"নিয়মিত উপাসনার পর তাঁহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নূতন আসনে বসিবেন।

"স্বামী স্ত্রীকে বলিবেন, অদ্য আমরা আমাদের প্রধান পুরোহিত প্রভু পরমেশ্বরের সন্নিধানে এবং আমাদের সাক্ষীস্বরূপ অমরগণের সমক্ষে স্বর্গলোকে স্বর্গীয় বিবাহ সম্পাদনের জন্য একত্রিত হইলাম। ঈশ্বর ধন্য হউন!

"স্ত্রী বলিবেন, স্বস্তি, ঈশ্বর ধন্য হউন।"

"স্বামী। হে প্রিয়তমে, আমরা এ পৃথিবীর সুখ দুঃখ, পরীক্ষা প্রলোভন যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিয়াছি। জীবনের বিভিন্ন প্রকার পথে আমরা পরস্পরে সুখ দুঃখের সমভাগী হইয়া এক সঙ্গে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছি। সহযোগী ভৃত্যের ন্যায় একত্র কায়মনঃ প্রাণে আমরা প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়াছি, এবং আমরা তাহার পুরস্কারও পাইয়াছি। এক্ষণে স্বামী-আত্মা এবং স্ত্রী-আত্মার পবিত্র ব্রত গ্রহণ এবং অশরীরী আত্মাদ্বয়ের সম্মিলন সম্পাদন দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব বিবাহকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে পরিসমাপ্ত করিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর

আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, এবং উচ্চতর কার্য্যক্ষেত্রে এবং আনন্দধামের দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। অতএব আমরা তাঁহার পবিত্র রাজ্যে ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য যুগল ভৃত্য হইয়া থাকিব; এবং গভীর যোগে, একে তিন হইয়া, নিত্যকাল অবস্থান করিব। প্রিয়তমে, তজ্জন্য কি তুমি প্রস্তুত আছ?

"স্ত্রী। প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে প্রিয়তম, এই ব্রত অতি কঠিন, আমি অবলা; অতএব ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।

"স্বামী। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাদের দুর্ব্বল আত্মার সহায় হউন, এবং পরিত্রাণপদ আলোক এবং শক্তি বিধান করুন।

"স্ত্রী। স্বস্তি।

"স্বামী। এই নূতন বিবাহবন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য এবং এই পবিত্র গুরুতর ব্রত সিদ্ধির জন্য আমাদিগের প্রতি সপ্তাহকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঐকান্তিকতা, বিনয় এবং প্রার্থনাসম্ভূত আশ্বস্ততা সহকারে সাত দিন এই পবিত্র ব্রত সাধন করিব।

"স্ত্রী। তাহাই হউক।

"স্বামী। হে ঈশ্বরের কন্যা এবং দাসী, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে প্রদান কর, এবং মধুর আধ্যাত্মিক মিলনের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের হস্তদ্বয়ে এই পুষ্পমালা দ্বারা প্রকৃত প্রেমগ্রন্থি বন্ধন করিতে দাও।

"স্ত্রী। তাহাই হউক।

"স্বামী। এই প্রেমগ্রন্থি যদি যথার্থ আধ্যাত্মিক বন্ধন হয়, তাহা হইলে অদ্য আমরা একটী নিত্যকালস্থায়ী পুনর্ম্মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। অদ্য আমরা কালে বিবাহ করিলাম, কিন্তু বিবাহ করিলাম আমরা নিত্য-কালের জন্য। এখন পৃথবীতলে আমরা মিলিত হইলাম, ভবিষ্যতে স্বর্গলোকে সম্মিলিত দৃষ্ট হইব।

"স্ত্রী। আমিও সেইরূপ বিশ্বাস করি এবং আশা করি, অতএব তাহাই হউক।

"স্বামী। হে জীবন পথের সঙ্গিনী, এই গৈরিক বসন, এই একতন্ত্রী, এই আসন, এই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এবং এই নববিধান নিশান তুমি গ্রহণ কর, এবং চিরদিন বিশ্বপতির এই রাজপতাকার নিকট বিশ্বস্তা ও ভক্তিমতী হইয়া থাক।

"স্ত্রী। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি এই সকল গ্রহণ করিলাম।

"স্বামী। প্রভু পরমেশ্বরের এই আদেশ যে আমরা হৃদয় এবং হস্তকে পরিষ্কার রাখি; ক্রোধ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াশক্তি ও সাংসারিকতা পরিত্যাগ করি; বিশ্বাস, সাধুতা, প্রেম ও সাধন ভজনে উন্নত হই; দরিদ্রকে ভিক্ষা, বিপন্নকে সাহায্য দিই; এবং শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান, সৎপ্রসঙ্গ এবং আত্মসংযম দ্বারা সমবিশ্বাসী সাধকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরস্পর এবং ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া সকল সাধনা এবং সুখের পরিসমাপ্তিকর যোগের মধ্যে প্রবেশ করি। ঈশ্বর আমাদের মিলনকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং ইহাকে পবিত্র এবং সুখকর করুন।

"স্ত্রী। স্বস্তি।

"পরে স্বামী এইরূপে প্রার্থনা করিবেন;—

"হে যোগেশ্বর, প্রকৃত যোগবন্ধন দ্বারা আমাদের আত্মাকে এমন করিয়া বাঁধ যেন আমি আমার স্ত্রীতে এবং তিনি আমাতে এবং আমরা উভয়ে নিত্য সম্মিলন এবং শান্তিতে তোমার মধ্যে স্থিতি করিতে পারি। আমাদিগকে পবিত্র এবং সাধু চরিত্র কর, এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং অমঙ্গল হইতে দূরে রাখ। আমাদিগকে এই সংসার হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া চল এবং এখন হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গধামে মধুর মিলন

এবং পূর্ণানন্দে তোমার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দাও।

"তদনন্তর, "আত্মার চির আনন্দ-স্বরূপ আমাদের ঈশ্বর ধন্য হউন" এই বলিয়া স্বামী ও স্ত্রী ভক্তিভাবে প্রভু পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবেন :— শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"স্বামী এবং স্ত্রী সপ্তাহকাল প্রার্থনা এবং যোগ সাধন করিবেন, এবং এক সঙ্গে বসিয়া এক তন্ত্রীযোগে ঈশ্বরের পবিত্র নাম গান করিবেন। তাঁহারা এই পবিত্র সপ্তাহের প্রতিদিন সদ্‌গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন এবং গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবেন। আরও, তাঁহারা দুঃখীকে ভিক্ষা, গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগকে আহার এবং বৃক্ষাদিকে জল দান করিবেন এবং ঈশ্বরের জন্য সদ্যোজাত পুষ্প চয়ন করিবেন; এবং তাঁহারা প্রতিদিন মণ্ডলীর একজন প্রধান ব্যক্তিকে ভোজন করাইবেন এবং উপযুক্ত উপহার দিবেন।"

ইং, ১৮৮২ সালের ২০শে অক্টোবর শ্রীব্রহ্মানন্দ এবং সতী জগন্মোহিনী দেবী এই যুগল-সাধন বা আধ্যাত্মিক-উদ্বাহ ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রতধারণ উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বৈরাগ্যবেশ পরিধান করিয়া কমল-

কুটীরস্থ উপাসনা গৃহে বিশেষ উপাসনা যোগে ব্রত গ্রহণ করেন এবং প্রার্থনাকালে সংসারের চাবি জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দেন। তাঁহারা সপ্তাহকাল ধরিয়া বিশেষ ভাবে ব্রত সাধন করেন। এই সপ্তাহ সতী নিম্নলিখিত ভাবে অধ্যয়ন, সেবা এবং দানাদি করিতে আদিষ্ট হন :—

“বার	অধ্যয়নের বিষয়	সেবা	দান
সোমবার	খৃষ্ট	স্বামী	সুবর্ণ
মঙ্গলবার	বুদ্ধ	পিতামাতা	রৌপ্য
বুধবার	চৈতন্য	ছেলেমেয়ে	তাম্র
বৃহস্পতিবার	মোহম্মদ	ভাইভগ্নী	বস্ত্র
শুক্রবার	নানক	দাসদাসী	অন্ন
শনিবার	হরগৌরী	দরিদ্র	ঔষধ

রবিবার যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী প্রচারকগণ জ্ঞানশিক্ষা। দৈনিক নির্জ্জনধ্যান, দেবালয় পরিষ্কার, স্বামী-স্ত্রী একত্রে প্রার্থনা ও যোগ সাধন।”

এই ব্রত সাধন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দ কয়েক দিন যে গভীর প্রার্থনা করেন, তাহাতেই তাঁহাদের সাধন উদ্দেশ্য এবং সাধন ফল সুন্দর এবং সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রার্থনা দৈনিক প্রার্থনা পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত

রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে "যুগল ব্রত গ্রহণ," "সতীত্ব লাভের অভিলাষ," "একাত্মতা" এবং "যুগল ব্রত উদ্যাপন" এই কয়টী প্রার্থনার সার সার কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই বেশ বুঝা যাইবে এই পবিত্র ব্রত কি উচ্চ ও কি গভীর এবং যাঁহারা এই ব্রত জীবনে সাধন করিয়া মানবের নবজীবন লাভের নূতন পথ খুলিয়া দিলেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের কত উচ্চ শিখরে উন্নীত। কয়টী প্রার্থনার সার এই :—

"হে দীনবন্ধু, হে পতিতদিগের পরিত্রাতা, তোমার প্রসাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া তোমার বিধি গ্রহণ করিতে আসিলাম।

"এ ব্রত গম্ভীর, গম্ভীর হইতেও গম্ভীর। এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হয় না। এ ব্রতে আসক্তি ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, এ ব্রত একটী বিশেষ ব্রত। ইহা জীবনের অপরাহ্ন সময়ের ব্রত। এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্যান্য ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত।

"মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের অপরাহ্নে সতী স্ত্রীর শীতলছায়া, শ্রান্ত স্বামীর

পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র মিলনের সময়, বহুদিনের আশা পূর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন।

"অনেক দিন হইল দুই জনে ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইতাম জানিতাম না, নৌকাখানা জলে ভাসাইয়া দিল। সেই তরী ভাসিতে ভাসিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বহুকালের আশা দীনবন্ধু তুমি পূর্ণ করিলে।

"চারহাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধর্ম্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ চার হাত মিলাইলে ধর্ম্মের ঘরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। বলিলে, সুখে থাক। আজ বড় সুখের দিন।

"এ বিবাহে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র প্রশান্ত সুন্দর। উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিত্র। নীচ তিক্তভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইব না। এমন ভালবাসিব পরস্পরকে যাহা বিষয়ী স্বামী স্ত্রীরা কখনও পারে না। পরস্পরের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব।

"মা, এত শীঘ্র যে এ আশা পূর্ণ করিবে জানিতাম না। মা প্রার্থনায় কি না হইতে পারে? প্রার্থনা কি সামান্য? এই একটী সামান্য ছোটলোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে কি পাইল!

"এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা। একদিকে আমি, আর উনি অন্য দিকে চলেন। কিন্তু এখন কি সয়তান বাধা দিতে পারিল? শয়তান যে বলেছিল, দুজনকে দুই পথে রাখিবে। পরস্পরের দেখা হবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক বিঘ্ন থাকিবে। স্ত্রী-পরিবার লইয়া যে হরিনাম করিবি তা পারিবি না। শয়তান, তুই যা, দূর হ! তুই কি কিছু করিতে পারিলি?

"আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশা পূর্ণ হইতেছে। মা, তুমি দেখালে হরিনামে কি হইতে পারে।

"মা, কবে আমরা দুজন যুগল সাধন করিতে করিতে শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। শুভদিনে শুভক্ষণে পরলোকের যোগ আরম্ভ হইল। আমরা দুজন এখন থেকে মা ভগীবতী তোমারই। তোমার চরণে চিরদিন বসিবার অধিকার চাই। আসন দুখানি তোমার চরণতলে

থাকিবে; উপাসনা, সংসারের সকলই ওখানে বসে করিতে হইবে। আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী রাগী স্বামী হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে পারিব না।

"এবার কি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না, মা? মা আমার সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন।

"মা, নববিধানের যুগল সাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগা হতভাগিনী দেখাক্। হতভাগ্য আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য হইল। মা, অনেকের সংশয় ছিল, এটা হইবে না। সকলে দেখিল বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল। এক আসনে বসিল, এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহা হইল তখন গেল শোক, গেল নিরাশা, গেল দুঃখ।

"নববিবাহে যে পতি-পত্নীর মিলন হয় এটা কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে প্রমাণ করিলে এটা হয়।

"ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল। কটাকে পাই, আর বাড়ীখানা তোমার হয়, তা হলে এখনকার মত অনন্তকালের জন্য এক পরিবার

হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, তুদিন বলেছি, মা।

"স্ত্রীকে পোড়াইলে আবার সেই জ্বলন্ত আগুন হইতে নবস্ত্রী বাহির হইবে, এটা দেখাও প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বাস হয় না। মা, তোমার পদচুম্বন করি। তোমার নব-বিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ুক।

"মা, এতদিনের কান্নাকাটির পর এ গরিবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। এ কি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষ এক হইল? একজন আমার কাছে বসিল, যে ইহকাল পরকালের জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা তুইটির যোগ হইল।

"স্ত্রী আর মেয়েমানুষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম।

"লও তবে সন্তানগণ সংসারের চাবি ; লইয়া সংসার পালন কর। আমাদিগকে অবসর দাও সংসার হইতে। তু'জনে চলে যাক্ পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর ধার দিয়া সেই সুখের গ্রামে।

"মা, পুত্রকন্যা পুত্রবধূ ইহাঁরা সংসারে ধর্ম্ম পালন করুন ; তাঁহাদের এখনও কাজ আছে, তাঁরা সেই সব

কাজ করুন। আমাদিগকে অবসর দিন সংসার হইতে। আমরা আশীর্ব্বাদ করিব তাঁদের, যে বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম করিতে সময় দিলেন তাঁরা। তাঁদের যা কাজ তাঁরা করুন। তাঁরা আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টি-স্বরূপ হউন।

"আর পুরাতন জীবন নয়। নূতন নৌকা ভাসাইল ছু'জনে। ছু'জন লোক রৌদ্রে বাহির হইল।

"ছুটী শ্রান্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া গিয়া সেই বিধানের বৃক্ষে বসিবে। মা, অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন।

"আমরা ছু'জন একজন হইলাম, তোমার হইলাম। দাস ব'লে দাসী ব'লে মনে রেখো। এ নূতন ব্রতের পথে এই কঠোর পথে এই পুরুষটিকে এই মেয়েটিকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিও। আমরা ছুটী বৈকুণ্ঠবাসী, বৃন্দাবনবাসী হইলাম। বৈরাগ্যের ভস্ম মাখিলাম। আজ সকলে বিদায় দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমাদের চায় না।

"বন্ধুরা চান কি না জানি না, চাহিলে আসিতেন সঙ্গে। বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এঁরা সংসারের কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন। এক নৌকায় সকলে যাবেন, তা ত হ'ল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠাইলে কেন? যাঁদের

একসঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল, তাঁরা ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেন কেন ?

“আচ্ছা তাই হউক, দুটো লোককে বিদায় দিয়া তাঁরা যদি সুখী হন, তাই হউক।

“আমরা এদেশে আর থাকিব না, এ দেশের কিছু ছুঁইব না, অন্য দেশে চলিয়া যাইব।

“হে মাতঃ, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার কপটতা অসরল ভাব ত্যাগ করিয়া দুইজনে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি।”

শ্রীব্রহ্মানন্দ আরো প্রার্থনা করেন ঃ—

“হে প্রেমসিন্ধু, প্রেমের আকর, বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি সাধনের বলে ক্রমে তোমার ভিতর আমরা মিলিয়া যাইতেছি।

“হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে তবে স্বামী এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে স্বামী যিনি তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি যিনি পত্নীত্ব পাইলেন। দুইজনে তোমার প্রকৃতিতে মিলাইলেন।

"পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কৃপা করে ঘুচাইয়া দাও, এই প্রভেদ ভাল নয়। আমরা সকলেই নারী প্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য্য শুদ্ধতা পাইব।

"একা একা ত হবে না। দুইজনে বসিব, পুরুষ প্রকৃতি প্রকৃতি পুরুষ এই ভাবিতে ভাবিতে পুরুষের জ্ঞান, পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পরিণত হইবে।

"নারী-প্রকৃতির প্রেম দাও; তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে ভক্তি করিতে দাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামি-সেবা, প্রভু-সেবা করিয়া জীবন কাটাই।

"আমরা দুইজনে নারী হইয়া তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। যুগল সাধনের পূর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন করিব, তার নিয়ম ব'লে দাও।

"খুব শুদ্ধ এবং সুখী হব, আর এ স্বভাব রাখিব না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য পাইব। লোকে বলিবে আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে। সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন কোমল হইয়াছে। মার শোভাতে সন্তানের শোভা হয়েছে।

"মা, কোমল কুসুমের মত সুগন্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে কেন এ সব থাকে? এ সব পুরুষ কণ্টক বিনাশ কর।

"পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, খুব পবিত্রতা দাও।

"সতী নারীর মত সতী হয়ে ঐ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে ঐ এক পতি, পরকালে ঐ এক পতি, অনন্তকালের ঐ এক পতি। যুগল সাধনের এই ফল।

"স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া সাধন করিলে মন সতী হইয়া পতির অন্বেষণ করে। জন্মজন্মান্তরে চিরকাল অনন্তকাল, ঠাকুর তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে।

"মানুষের সম্পর্ক নয়, নির্ব্বাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার প্রেম সমুদ্রে মিশাইবে। হৃদয়ের জ্বালা অশান্তি ঘুচিবে। ভাই ভাইএ, ভগ্নীতে ভগ্নীতে বিবাদ রহিল না।

"দেব, চাই দেবীত্ব। সতী হইতে চাই। ঐ এক চাই,—ভাবিতে ভাবিতে ঐ এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া তোমার ভিতর এক কর।

"প্রেমময় দীনবন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যুগল সাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া শীঘ্র শীঘ্র তোমার ভিতর বিলীন হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ "একাত্মতা" সম্বন্ধে আরো এই প্রার্থনা করিলেনঃ—

"হে দীনজন-প্রতিপালক, হে চির-বসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা নববিধানের তাৎপর্য্য।

"একজন মধ্যবিন্দুতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই।

"গুরু ব'লে, মধ্যবর্ত্তী ব'লে মানিতে হয় না। কিন্তু ভগবানের লীলা ব'লে অভিপ্রায় ব'লে এ সব মানিতে হয়। হে পিতা, নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি।

"যারা পরস্পরের নয় তারা আমারও নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, একথা মানিতে হইবে। যাঁরা এক জন হন তাঁরা তোমার, তাঁরা বিধানের।

"আমি চাই হে ভগবান্, সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিলীন হয়ে যান। দশ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরজা দিয়া যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেম সমুদ্রে ডুবিব।

"অনেকে সস্ত্রীক তোমাকে সাধন করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যায়। বন্ধুরা এক খানা হয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন তোমায় গাড়ি ক'রে।

"মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব ? এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই।

"ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, "আমি আমি" যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহি না।

"এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।"

যুগল ব্রত উৎযাপন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দ এই প্রার্থনা করেন ঃ—

"হে দীনবন্ধু, হে শরণাগত-বৎসল, ব্রত উদ্‌যাপন করিবার দিনে তোমার নিকট ব্রতধারী বিশেষরূপে ধন্যবাদ করিবার জন্য আগত। হে ব্রতদাতা, ব্রতের ফলদাতা সিদ্ধিদাতা তুমি।

"তোমার বিধানের মধ্যে সব যে প্রত্যক্ষ। তোমার কাছে কি বলিব ? সপ্তাহ কাল সস্ত্রীক তোমার চরণতলে বসিয়া অতি অল্প পরিমাণে সাধন করিয়াছি। কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। বুদ্ধি ও অনুভবের পক্ষে যথেষ্ট।

"বুঝিলাম যে পতিপত্নী এত অধিক বয়সে আবার নূতন চক্ষে নূতন প্রেমে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। নূতন সংসার নূতন পরিবার কি বুঝিলাম।

"চল্লিশ বৎসর সংসারে ঘুরিয়া, একত্র উপাসনা করিয়া যাহা হইল না, এই ব্রতে তাহা হইল। সে যেন সাত্ত্বিক, সে যেন ভাগবতী তনু, সে আর এক সুখ।

"কৃপা করিয়া যদি এই নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে তবে এই নব-বিবাহ, এই দুই হৃদয়ের মিলন, চারি চক্ষের মিলন, যেন ইহকাল পরকাল অনন্তকালের জন্য স্থাপিত

হয়। ভগবান্ এই সম্বন্ধ স্থায়ী কর। এ যে পবিত্র নূতন সম্বন্ধ। নরনারীর ভিতর শরীরের যোগ আর রহিল না, এই কার্য্যের ভিতর পবিত্র সুখ দিলে।

"বুঝিতে পারিলাম এই জীবন কিসের জন্য, বিবাহ কিসের জন্য, অন্তে সন্ন্যাস। বুঝিলাম, সংসারের সুখ, পরিবার পুত্র কন্যা কিসের জন্য। এ জন্য যে আশু তোমার দাসদাসী তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিবে।

"এই পথে বিমলানন্দ। কলহ বিবাদের পথ ছাড়িয়া আসিলাম। এখানে সকলি পবিত্র, সকলি নির্ম্মল। পাপের আর সম্ভব নাই। হরি আশীর্ব্বাদ কর তোমার প্রসাদে সপ্তাহান্তে ব্রত পালন করিয়া জয়ী হইলাম।

"এখন বামে বামা, অন্তরের অন্তরে ভগবান, এই তিন জনে এক হইয়া বৈরাগ্যের শ্মশানে বসিয়া বিশুদ্ধ হইতে চাই।

"জীবনের নৌকা তোমার প্রসাদে এত দিনে ঠিক পথে আসিল। সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া না না পথে গিয়া এখন যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

"সংসারের সকলে শোন, সংসারের ধন মান সম্পদ ঐশ্বর্য্য কিছু বাধা দিতে পারে না, ভগবানের প্রসাদে অন্তে এই পবিত্র পথে আসিতে পারা যায়।

"ভগবান, স্বর্গের দ্বারে আসিলাম, সপ্তাহান্তে বর দাও। পুরাতন অসার সংসারের কথা যাঁরা বলেন সে সব সঙ্গী চাই না। সৎপ্রসঙ্গ যেখানে দুঃখী তোমাকে যেখানে ডাকে, সেখানে যাইব।

"জগদীশ, প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া যাঁরা আসিতে চান, তাঁরা যদি আসেন দেখা হইবে। আমার পথ এই স্থির হইল, সম্মুখ এই দিকে আমার গতি। যাঁহারা আসিতে চান আসিবেন, সকলে যেন এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

"আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই।

"মা, বিশেষ ভিক্ষা এই, যাঁরা বিপথে গিয়াছেন সেই আত্ম-প্রবঞ্চিত ভাই ক'টি যেন তোমার বিশেষ দয়াতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। এখান থেকে পত্র লিখে পাঠাই, তাঁহাদের সময় থাকিতে থাকিতে যদি চেষ্টা করেন, তবে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এই পথে তাঁহারা আসিতে পারিবেন।

"এই পথে যোড়া যোড়া চলেছে। এখান থেকে স্বর্গের সুমিষ্ট বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনা যায়। দেবদেবীদের সুমধুর সঙ্গীত এখান থেকেই শ্রবণ করা যায়।

"অবিশ্বাস করিও না ; যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে স্পর্শ করেছে সে বলিতেছে।

"গতিহীনের গতি ভগবান, দয়া কর। বন্ধুরা কোন্ ঘাটে রহিলেন ? তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকো, বেড়িও। যাতে ভাল হয় করিও।

"ভারতবক্ষের ধন, এই কথা ভারত শুনিবে। ভারতের যাতে কল্যাণ হয় করিও।

"মা, তোমার সংবাদ দিয়াছ, তোমারই কথা বলিয়াছি। যদি লোকে না লয় আমি কি করিব। প্রাণেশ্বর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার যিনি সঙ্গের সঙ্গী তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত হইয়া সচ্চিদানন্দের সেবা করি, এই যোগের পথে অগ্রসর হই।

"এখানে সংসার নাই, অসৎ নাই, ইন্দ্রিয় সেবা, ধন মান সেবা নাই, জঘন্য সংসারাশক্তিকে তুচ্ছ করিব। ঘনসচ্চিদানন্দকে লাভ করিব, স্বর্গের লোকগুলিকে খুব চিনিব, দু'জনে মিলে তাঁদের বাড়ী যাব, তাঁদের সঙ্গে খুব পরিচিত হব।

"আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য। হরগৌরীর ভাব সাধন করি। আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে। আমি যেন

মহাদেবের শিষ্য হইয়া পত্নী ক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়া চিদাকাশে উত্থিত হই। পরিবার, সন্তান, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সমুদয় লইয়া তোমার ভিতর বিলীন হইয়া যাইব। এ ব্রতের ফল এই।

"হে দয়াসিন্ধু, অধমতারণ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সপরিবারে সবান্ধবে এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।"



স্ত্রী-আত্মায় স্বামী-আত্মায় একাত্মা—"একজন"।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মায় আত্মায় বিবাহই আধ্যাত্মিক উদ্বাহ ; ইহাই যুগল-সাধনের উদ্দেশ্য। দেহত্যাগেই জীব আত্মস্থ হন। কিন্তু দেহ থাকিতে থাকিতেও যাঁহারা যোগে অদেহী হন, তাঁহারাও আত্মস্থ এবং তাঁহারাই এই আধ্যাত্মিক উদ্বাহ সাধন করিতে অধিকারী। দেহের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া স্বামী স্ত্রী আত্মিক ভাবে পরস্পরকে দর্শন করিবেন যুগল-সাধনের ইহাই পরিণতি। ইহাতে পরস্পরের যে কেবল দেহের সম্বন্ধ থাকিবে না তাহা নহে, কিন্তু পরস্পরকে দেহী-ভাবেই আর দেখিবেন না। আত্মা যেমন আত্মাকে দেখেন ও সম্বোধন করেন, তেমনি ভাবে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ হইবেন। দেহী হইয়াও তাঁহারা দেহী নন কেবল আত্মা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনী দেবী এই যুগল-সাধনের পূর্ব্ব হইতেই যে পরস্পরের সহিত কিরূপ আত্মিক ভাবে চির-সংবদ্ধ, তাহার প্রমাণ শ্রীব্রহ্মানন্দের "স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মার সম্বোধন পত্র।"

এই "স্ত্রী-আত্মার প্রতি স্বামী-আত্মা" নামে প্রবন্ধ এই সময় "নববিধান" পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহারই সার কথা আমরা অনুবাদ করিয়া এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনীর পরস্পরের যে কি আত্মার যোগ তাহা বিশিষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। যুগল সাধনে এই যোগ আরো ঘনীভূত ও বাহ্যত প্রমাণিত হইল মাত্র।

শ্রীব্রহ্মানন্দ এই পত্রে বলেন ঃ—"প্রিয়ে! তুমি আমার নিকটে এক রহস্য। বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তুমি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি ছিলে, কিন্তু এখন বন্ধু। তোমার বাড়ী সেখানে, আমার বাড়ী এখানে ছিল, এখন আমার বাড়ী তোমার এবং আমার তাবৎ সামগ্রীও তোমার। আমাদের সন্তানগণ তোমাকে তাহাদের মা এবং আমাকে তাহাদের পিতা বলিয়া ডাকে।

"প্রিয়ে, আমরা দুইজন ছিলাম, এক্ষণে আমরা এক আত্মা হইয়াছি। আমরা দুই এক, এ এক অদ্ভুত রহস্য; কে ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে। সে কোন্ শক্তি যে হৃদয়ে হৃদয়ে এমন নিকট সম্বন্ধ এবং ঐক্য স্থাপন করিল? সত্যই সেই অনন্ত আত্মা কে?—আমি জানি না; কেমন,—তাহাও জানি না।"

"এই ব্যক্তি কে, আমি আপন অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম। অন্তরে এক বাণী বলেন, 'জীবনের কার্য্যে তোমাকে উল্লসিত ও সাহায্য করিতে ভগবান্ কর্ত্তৃক ইনি প্রেরিত। তোমার সুখ দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য ইনি ঈশ্বর-প্রেরিত; স্বর্গের লোক বলিয়া ইঁহাকে গ্রহণ কর; ইঁহাকে নমস্কার কর এবং ইঁহাকে তোমার করিয়া লও।' এইরূপ শুনিলাম, এইরূপই করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি এই ব্যাপারের ভাব কিছুই বুঝিল না এবং এ পর্য্যন্তও ত বুঝিতে পারিল না।

"যখন তোমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল; এই ভাবকে লোকে প্রেম বলে। প্রেম কি, আমি হৃদয়ঙ্গম করি, কিন্তু বলিতে পারি না, ইহা কি।

"এই বিশাল বিশ্বে আর কাহাকেও কেন তেমন ভালবাসি না, যেমন তোমাকে বাসি। তোমার মত এমন ভাল কি আর কেহ নাই? এমন গুণ-সম্পন্ন কি কেহ নাই? তবে তুমি কেন আমার হৃদয়ের আনুগত্য ও অনুরাগ আকর্ষণ কর, যাহা আর কেহই পারে না? অহো! তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপর

এই নিগূঢ় শক্তি এবং আধিপত্য দিয়াছেন। স্বর্গের সুন্দরী কন্যা, তোমার পিতাই তোমাকে হৃদয় রজ্জুর সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং এইরূপে

"আমি তোমার

"তুমি আমার

"স্বর্গের প্রেমে।"

"আমি কি বলিলাম স্বর্গের প্রেম ? হাঁ, পৃথিবীর নয়। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম অতি পবিত্র অনুরাগ, স্বামী স্ত্রীর প্রেম স্বর্গীয় প্রেম, কে তাহা সংশয় করিবে ? তাহারা মহান্ পবিত্র ঈশ্বরের অবমাননা করে, যাহারা ইহাকে ইন্দ্রিয় ব্যাপার মনে করে।

আমার বন্ধু, আমাদের প্রীতির স্বর্গীয় ভাবের সাক্ষী হও, সঙ্কুচিত হইও না। ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন আমি তোমাকে ভাল বাসিতেই পারিতাম না। আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিতামই না, যদি না ঈশ্বর আমাকে তোমায় ভালবাসিবার শক্তি দিতেন।

"দাম্পত্য প্রেমের সম্বন্ধ, ভাব, শক্তি, কর্ত্তব্য এবং আনন্দ সকলই পবিত্র।

"যখন তুমি প্রথম আমার নিকট আসিয়াছিলে এবং বিবাহমণ্ডপে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলে তখন আমি

তোমার গলদেশে পুষ্পমালা দিই নাই, কিন্তু তোমার আত্মার গলদেশে দিয়াছিলাম। হে নারি, তোমাকে নয় কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।

"সুখের জন্য তোমাকে বিবাহ করি নাই, কিন্তু তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য, অমরত্বের পথে আমার সহযাত্রী হইবার জন্য স্বর্গের অনুমতি পত্র লইয়া আসিয়াছিলে বলিয়া আমি বিবাহ করিয়াছি।

"বিষয় কোলাহল ও প্রলোভন রাশির মধ্যে একটী স্বর্গীয় গৃহ, একটী ধার্ম্মিক সুখী পরিবার, একটী তপোবন সংরচনা করিতে আমরা পরমাত্মার নিকট হইতে গুরু ও সাক্ষাৎ আজ্ঞা পাইয়াছি।

"আমার সমক্ষে এক স্বর্গের অদৃশ্য অলঙ্কারে ভূষিতা আত্মারূপে, আমার সাধন ভজনের প্রিয় সঙ্গিনীরূপে ও অধ্যাত্ম জগতের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে তুমি বিরাজমান। অতএব তোমার স্বামী তোমাকে অধ্যাত্ম প্রেমে প্রীতি করিতে এবং তোমার সহিত ধর্ম্মের সখ্যভাবে সংযুক্ত হইতে বাধ্য।

"যখন আমরা আমাদিগের দৈনিক গৃহ কার্য্য করি, আমরা তখনও ঈশ্বরেরই কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মী।

"আমাদের প্রেম ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া কি অল্প আগ্রহশীল? ভজন-সাধন-নিরত বলিয়া কি অল্প অনুরাগী?

"বস্তুতঃ, এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে বৈরাগ্যভাবে সেবা করিবার জন্য আপন স্ত্রীদিগকে ঘৃণা করেন।

"আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা আপন স্ত্রীদিগের সন্তোষ ও সেবা বিধানের জন্য ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা পরবশ হন।

"আমার ভাব অনেক উচ্চ। তুমি যখন ঈশ্বরের, আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমাকে ঘৃণা করা পাপ। তোমাকে সমাদর করা তোমাকে ভালবাসা আমার কর্ত্তব্য।

"পরম পিতার সমক্ষে তোমায় লইয়া পূজা করিব। তুমি তোমার মধুর স্বরে তাঁর নাম গান করিবে এবং আমার হৃদয়কে বিমোহিত করিবে।

"তুমি সমুদয় সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ এবং তাবৎ কুপ্রবৃত্তি, লঘুতা, চঞ্চলতা, এবং অর্থলালসা পরিহার করিবে এবং বৈরাগিণীর দীনতা ও নম্রতার ব্রত গ্রহণ করিবে।

"তুমি সর্ব্বদা আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভুর সেবাতে এবং জীবনের গুরু কর্ত্তব্য সকল সাধনে আমার সহিত যোগদান করিবে।

"এইরূপে আমরা ঈশ্বরেতে ইহকাল এবং অনন্ত-কালের জন্য এক-আত্মা হইয়া সংযুক্ত হইব এবং চিরকল্যাণ এবং আনন্দ আমাদিগের হইবে।

"আমাদের প্রেম পবিত্র বৈরাগ্যের প্রেমে পরিণত হউক এবং স্থায়ী আধ্যাত্মিক সখ্যভাবে পরিপক্ক হউক।

"সংসারাসক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ যে স্বামী, সে তাহার স্ত্রীকে ত যথার্থ ভালবাসে না। বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রীতিতে ও প্রোৎসাহিত অনুরাগে ভালবাসিতে পারে, কারণ তাঁহার ভালবাসা ঈশ্বর হইতে সমাগত। এই প্রেমই যেন আমাদের হয়।

"হে আত্মা, এই দেখিতে দেখিতে তোমার দেহ যেন অদৃশ্য হইয়া গেল ও তাহার সহিত সমস্ত সংসারের যাহা কিছু জড়িত তাহাও গেল এবং এক আত্মাময়ী স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই রহিল না।

"আহা কি স্বর্গীয় দৃশ্য! পরমা মাতার কোলে এক আত্মা-স্বামী এবং এক আত্মা-স্ত্রী উপাসনা এবং যোগের অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন!

"প্রিয়তমে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বাস্তবিক, এই দেহে থাকিতে থাকিতেই যাঁহারা অদেহী বা আত্মাবান আত্মস্থ তাঁহারা ভিন্ন স্বামী স্ত্রী

পরস্পরকে কে এরূপ আত্মারূপে দর্শন করিতে পারেন এবং এইরূপে পরস্পরকে আত্মারূপে দর্শন ভিন্ন কি যথার্থ দুই আত্মা একাত্মা হইতে পারে ?

শ্রীব্রহ্মানন্দের দেবাত্মার সহযোগে সতী জগন্মোহিনী দেবী তাঁহার সহিত আত্মস্থ আত্মাবান্ হইয়া এমনই একাত্মতা লাভ করিলেন ও এমনই তাঁহাতে আত্ম-নিমজ্জিত হইলেন যে তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বও আর রহিল না। তাই শ্রীব্রহ্মানন্দও স্বীকার করিলেন "আমরা দুইজনে একজন।"

এক্ষণে শ্রীব্রহ্মানন্দ এই সতীসনে "দুইজনে একজন" হইয়া যে কেবল তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মিলনেরই সত্যতা সপ্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা নহে, তাঁহারা "দুইজনে একজন" হইয়া নববিধানেরও পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে বলেন, "একজনে কয়জন মিলিয়া পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সকলে মিলিয়া ব্রহ্মেতে বিলীন হইবে ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য"; এবং ইহাও আক্ষেপ করিয়া বলেন যে "ইহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না।"

হায়! কবে আমরা ব্রহ্মানন্দের কথা প্রমাণ মানিয়া তাঁহার আক্ষেপ মিটাইয়া তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া পরস্পরে মিলিয়া সর্ব্বজনে "একজন" হইব।

এই সর্ব্বজনে একজন হওয়াই নববিধানের যথার্থ তাৎপর্য্য। ব্রহ্মানন্দ ও সতীর একাত্মতা তাহারই আদর্শ। বাস্তবিক সতী জগন্মোহিনী দেবী যেমন ব্রহ্মানন্দে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার সনে একাত্মা হইয়া গেলেন, তেমনি আমরাও ও প্রতি মানব এক ব্রহ্মানন্দে আমিত্ব-নিমজ্জন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিয়া ব্রহ্মেবিলীন হইতে পারিলেই নববিধানের পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন হইবে।



শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ-দেবের স্বর্গারোহণ।

দেখিতে দেখিতে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শরীর নিতান্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। আত্মারাম আর যেন সে সোণার দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে চাহিলেন না। এক বৃক্ষে দুইটী পাখী বসিয়াছিল একটী উড়িবার উপক্রম করিল। শ্রীকেশবচন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে দেখিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সিমলা পাহাড়ে পরিবর্ত্তনে যাইতে পরামর্শ দিলেন। সতী দেবীও ছেলে মেয়েদের লইয়া স্বামীর পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার সহিত সিমলা যাত্রা করিলেন। সিমলায় গিয়া ব্রহ্মানন্দের শরীরের উন্নতি যত না হউক, মহাযোগের উন্নতি খুব বৃদ্ধি হইল, সতীদেবীও সেই মহাযোগের ভাগিনী যথেষ্টই হইলেন।

দেবী দেখিলেন আচার্য্যদেবের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন কেমন সর্ব্বদাই তিনি নিস্তব্ধ, নিরাশ, দুঃখিত ও বিষণ্নভাবে থাকিতেন। তখন হইতেই দেবী সম্মুখে এক বিপদ আসিতেছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘরে বাতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তিনি স্বভাবতঃই অন্ধকার দেখিতে পারিতেন না, কেমন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন। তাই বাতি নির্ব্বাণ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কি একটা ভয়ঙ্কর বিপদের পূর্ব্বে যেন তাঁহাকে কে জাগ্রত করিয়া দিতেছে এইরূপ মনে করিলেন। ইহাতে ভয় ভাবনাতে তাঁহার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

উপাসনায় বসিয়া তিনি কতই রোদন করিতেন। তিনি ভবিষ্যৎও বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আচার্য্যদেব যে অচিরেই দেহত্যাগ করিবেন, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগবানে নির্ভর পূর্ণ হৃদয় সে ভাবী যাতনায় তখন অস্থিরতা কি কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখান নাই। কেবল চক্ষের জল শতধারে ফেলিয়া উপাসনার সময় ভগবানের চরণ ধৌত করিতেন। সে অশ্রু কেবল উপাসনার জন্যই যেন থাকিত।

এ সময় তাঁহার অর্থেরও যথেষ্ট অনটন হয়। কত দিন হয়ত ঘরে জ্বালিবার তৈলেরও অভাব হইত। সে সময় কত কষ্টই তাঁর জীবনে গিয়াছে। কিন্তু এ সকলই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। এমন কি যখন আচার্য্যদেবের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, টাকার

অভাবে তাঁহার পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাও কঠিন হয়।

সিমলায় শ্রীকেশবচন্দ্রের দেহ এতই খারাপ হইল যে তাঁহাকে আর সেখানে রাখা যুক্তিযুক্ত হইল না। সাবিত্রী যেমন সত্যবানকে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, সতী জগন্মোহিনী দেবীও সতীত্ব প্রভাবে ব্রহ্মানন্দকে কঙ্কালবৎ দেহে কোন রকমে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিলেন।

সিমলা হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দিল্লীতে কয়েক দিন আচার্য্যদেব সপরিবারে এক বন্ধুর গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীকেশবচন্দ্র পীড়িত, উক্ত বন্ধু তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একটী ছোট গৃহ তাঁহাকে থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বোধ হয় আহার করিবার সময় তাঁহাকে বন্ধুর গৃহে আসিতে হইত। উক্ত বন্ধুর মাতা একদিন দেবীকে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দুগ্ধপান করাইতে দেখিয়া তাঁহার এক নাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাগো, এদের ছেলেরা ঢক্ ঢক্ ক'রে এক এক বাটী দুধ খেলে, আর আমার ইহারা (নাতি) কি কিছু খায় না!" কেমন সকল সময় বৃদ্ধা একটা কোন না কোন রকম ভাবে আতিথ্যে অনিচ্ছুক জানাইতেন। বিশেষতঃ জাতিচ্যুত

বলিয়া কেমন যেন একটু ঘৃণা ঘৃণার ভাবও দেখাইতেন। দেবী ইহা দেখিয়া শুনিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইতেন। যে অল্প কয়েক দিন তথায় ছিলেন, অতি ভয়ে ভয়েই থাকিতেন। দিল্লী হইতে কয়েকদিন কাণপুরেও অবস্থান করেন। যাহাহউক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই দেবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া সেই ঘোর চিন্তাভার যেন কিছুমাত্র লঘু হইল।

সতীজীবনের চরম পরীক্ষার কাল কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে শীঘ্রই নিকট হইয়া আসিল। কারণ শ্রীব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ সতী জগন্মোহিনীর শুধু কেন সমগ্র বিধান পরিবারেরও বিষম পরীক্ষা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াই "নব দেবালয়" নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া দেন। ইষ্টকাদি ক্রয় করিবারও পয়সা ছিল না, তাই বাটীর পশ্চিমদিকে যে কয়টী ভাঙ্গা ঘর ছিল তাহাই ভাঙ্গাইয়া ইট্ কুড়াইয়া এই দেবালয় নির্ম্মাণ হয় এবং স্বর্গারোহণের সাত দিন মাত্র পূর্ব্বে এই দেবালয় স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শরীর তখন এতই রুগ্ন যে তাঁহাকে চেয়ারে করিয়া নীচে লইয়া যাইতে হয়, কিন্তু দেবালয়ে পৌঁছিয়াই সিংহের ন্যায় সবল হইয়া নিজে বেদীর উপর বসিয়া

প্রত্যক্ষ মাকে দেখিয়া ছেলে যেমন মাকে দেখিয়া কথা কয় এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এখন ত দেবীর মন সদাই নিতান্ত অবসন্ন থাকিত, ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া ক্রমে তিনি একান্তই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। আচার্য্যদেবও দেবীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন তাঁর এক কন্যাকে বলিলেন, "তোর মাকে কেন দেবালয় দেখা'তে নিয়ে যাস্ না?" কন্যা বলিলেন, "না, মা ও সব কিছুই দেখেন না।" যখন আচার্য্যদেব শয্যাগত, রোগ খুবই প্রবল, তখনও তিনি একদিন বড় কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আহারাদি হয়েছে কিনা?"

এমন সময় একদিন দেবী অতি নিরাশার সহিত দুই একটী লোককে বলিলেন, "কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ছে না, এ রোগ সারবার নয়, ক্রমেই যে বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌ল, কি হবে?" তখনকার সেই গৃহ, সেই অল্প বাতির আলোক, দেবীর সেই নিরাশার কথা এ সকল স্মরণ করিতেও চক্ষে জল আসে। হায়! কি নিদারুণ সময়ই বিধাতা তাঁর সম্মুখে আনিয়াছিলেন। পর্ব্বতে যখন আচার্য্যদেব যোগের সময় হাসিতেন ও তাঁর উন্মত্ত অবস্থা হইত, দেবী তখনই জানিতে পারিয়াছিলেন পৃথিবীতে ব্রহ্মানন্দ

আর বেশী দিন থাকিবেন না। কি হয়, কি হয় এই যে একটা ভাবনা, ইহাতেই তাঁহাকে অস্থির করিয়াছিল।

এই সময় নাকি একদিন শ্রীব্রহ্মানন্দ সেই রোগ শয্যাতেই আক্ষেপ করিয়া বলেন "আমার ত কেউ হ'লো না, আমার উঁচু ধর্ম্ম কেউ নিলে না।" ইহাতে সতীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি বিশ্বাসের বলে বলিলেন "তুমি মার প্রেরিত-ভক্ত, তোমার ধর্ম্ম কেউ নেবে না, এ কি হয়?" ব্রহ্মানন্দ ইহাতে বলিলেন "আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না, তোমরাই সাম্‌লে থেকো। আমার কথা কটা রইল, এখন কেউ না নিলেও পরে নেবে।" সতী দেবী ইহাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কতই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

সাধ্বী সতী দেবী শ্রীকেশবচন্দ্রের রোগ যখন অত্যন্তই বৃদ্ধি হইল তখন আর স্থির হইয়া তাঁহার নিকট বসিতে পারিতেন না। কেবল পাগলিনীর ন্যায় এঘর ওঘর করিতেন। যখন ডাক্তারগণ আশা ছাড়িয়া দিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই দেবীর চীৎকার ক্রন্দনে সকলেই অস্থির হইল। সতী একদিন আচার্য্য-মাতার চরণে মস্তক রাখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার আশীর্ব্বাদে যে সব ভাল হবে।" এই সময় মা

সারদা দেবীও শ্রীব্রহ্মানন্দকে বলেন "বাবা কেশব, আমার পাপের জন্যেই কি তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো? তোমার মা ত বড় ভালো, তিনিও তোমার কথা শুনেন, তাঁকে নয় বল না তোমার এ যন্ত্রণা দূর করে দেন।" শ্রীকেশব ইহাতে বলিলেন "না মা আমার যা কিছু সব যে তোমারই গুণে। আমি মার কোটী ধনের অধিকারী আমি কি মাকে সামান্য পুইশাক চাব? ছি মা! আমার কষ্ট কি? আমার ভাল মা আমাকে এ কোল থেকে ও কোলে নিয়ে আদর করে তুলছেন ফেলছেন। তাইতে আমি একটু হাঁপিয়ে পড়ছি এই যা—।" শ্রীব্রহ্মানন্দ আর এক সময় যাঁরা নিকটে ছিলেন তাঁহাদিগকে বলেন "আমি কারো মন্দ করিনি, কারো মন্দ ভাবিনি।"

৭ই জানুয়ারী সোমবার দিন যখন আচার্য্যদেব একটু স্থির হন, তার পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "ওঁরা অত কাঁদ্‌চেন কেন, তুমি বুঝাও না," জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিলেন "আমি বুঝালে কি হবে? তুমি বুঝালে শুন্‌বেন।" তিনি বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠের শোভা দেখ্‌বো না বুঝাব? আমি ত সেই কথাই বল্‌বো। সংসার মিথ্যা ও মায়া! আমি এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছি, তার তরে আর কান্না কেন?" পরে দেবীকে আত্মীয়ারা তাঁর নিকট

আনিলে দেবী বলিলেন, "তোমার সংসার কে দেখ্‌বে ?" আচার্য্যদেব বলিলেন, "আমার সংসার কেন, যাঁর সংসার তিনি দেখ্‌বেন।" এই বোধ হয় শেষ কথা তাঁর সঙ্গে হইয়াছিল।

পরদিন মঙ্গলবার ৮ই জানুয়ারী বেলা ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় শ্রীব্রহ্মানন্দ আচার্য্য কেশবচন্দ্রদেব সতী, সন্তানগণ, মাতা এবং শিষ্যগণকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া সহাস্য বদনে স্বধামে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁর মুখে যেন আর হাসি ধরে না ! কিন্তু এদিকে শোক আর্ত্তনাদে কমলকুটীর বিকম্পিত হইল, পৃথিবী যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দেবী একেবারে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন হইতেই ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন গৈরীক কাপড় পরিয়া "দয়াময় দয়া কর আমায় ভুলোনা" এই বলিয়া মহা আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দের তিরোধান সতীর হৃদয়ে যেন আকস্মিক বজ্রের ন্যায় নিহিত হইল, তিনি এমনই আত্ম-হারা হইয়া পড়িলেন যে অনেকের ভয় হইল যেন তিনি কবে কি করিয়া ফেলেন। এক দিন হঠাৎ যেন

উন্মাদিনী প্রায় হইয়া কেবল মাত্র সেমিজ পরিয়া দেবালয়ের ছাদের কার্নিসের ধারে উপস্থিত হন। সৌভাগ্য ক্রমে জামাতা কোচবেহারের মহারাজা শ্রীমৎ নৃপেন্দ্র নারায়ণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া সান্ত্বনা দান করেন।

সতী এক বৎসর ধরিয়া এইরূপে তাঁর ঘরের নিকট ছাদে চীৎকার করিয়া এতই ক্রন্দন করিতেন যে মনে হইত, দেবী আচার্য্য বিচ্ছেদে আর বেশী দিন জীবন ধারণ করিবেন না। এ ঘটনার কিছুদিন পরে দেবী নব দেবালয়ে উপাসনার পর তাঁর হাতের দুইগাছি বালা খুলিয়া ফেলিয়া দেবালয়ের সেবার জন্য অর্পণ করিয়া যথার্থ বৈরাগিণী সাজ পরিলেন। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে ও সে সময় যে উপস্থিত ছিল, সেই জানে কি মর্ম্মভেদী সে দৃশ্য! কি অতলস্পর্শ শোকসাগরেই তিনি মগ্ন হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক, যাঁহার তিরোধানে সমগ্র জগজ্জন কাঁদিয়া আকুল, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে সামান্য দীনহীন সেবক প্রজা পর্য্যন্ত যাঁহার শোকে একান্ত সন্তপ্ত; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ সমস্ত দেশের সমুদয় সংবাদপত্র যাঁহার নামে স্মারক প্রবন্ধ লিখিয়া কতই শোক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন

এবং কেহ বা "ইন্দ্রপাত" হইল, কেহ বা "চন্দ্র গ্রহণ" হইল, কেহ বা "নক্ষত্র পতন" হইল, কেহ বা "সূর্য্য অস্তমিত" হইল, কেহ বা "রাজা ও মহাপুরুষের পতন" হইল ইত্যাদি বলিয়া কত প্রকারেই আক্ষেপ করিলেন; যাঁহার সম্বন্ধে আমেরিকার প্রধান ধর্ম্মবক্তা জোসেফ কুক্ সেই জগতের সুদূর পশ্চিম সীমান্ত হইতে এই পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তোমার অভাবে যে সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেছি !" এবং যাঁহার শোকে অধীর হইয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সকলে একত্র স্বাক্ষর করিয়া এক সুদীর্ঘ সহানুভূতিপত্র সতী জগন্মোহিনীকে দান করিলেন, তাঁহার বিরহে তাঁর একাঙ্গিনী, চিরসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী পরমসাধ্বী সতী জগন্মোহিনী দেবী যে পাগলিনী হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যিনি পতী বই কিছু জানিতেন না, তাঁহার সে পতির তিরোভাবে যে কি হইল কে বলিতে পারে ? যাঁহার সহিত তিনি কেবল দেহে নয়, কিন্তু আত্মা মন প্রাণে চির-উদ্বাহিত, তাঁহার স্বর্গগমনে তিনি যে কেবল প্রাণ-বিহীন দেহমাত্র হইবেন বলা বাহুল্য। যথার্থই শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁহার পরিবারের কেবল নয় নববিধান মণ্ডলীরও প্রাণ-স্বরূপ। তাই আজ তাঁহাকে

হারাইয়া পরিবার ও দল উভয়েই মৃত কঙ্কালবৎ হইয়া পড়িয়াছে ; তাঁহার অভাবে আজ ব্রহ্মমন্দির আচার্য্য-শূন্য, নবদেবালয় বেদী-শূন্য, কমলকুটীর জন-শূন্য, মঙ্গলপাড়া শ্রীশূন্য, দরবার প্রেম-শূন্য, মণ্ডলী ও জাতি নেতা-শূন্য এবং সমগ্র দেশ প্রবক্তা-শূন্য। বলিতে কি শ্রীব্রহ্মানন্দের তিরোভাবে সত্যই এক মহা যুগ-প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে।



শ্রীকেশবের স্বর্গারোহণের পর—সতীর বৈধব্যসাধন—ব্রহ্মানন্দ-অনুগমন।

আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র ইং ১৮৮৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পর হইতে দেবী সতী জগন্মোহিনী আর সংসার পুত্র কন্যা কিছুই বড় একটা দেখিতেন না। সংসারের চাবিও ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এবং একেবারে অনাসক্তভাবে ১৪ বৎসর, কেবল পরলোক চিন্তায়, পরলোকের দিন গণনায়, অতিবাহিত করেন। বিধাতা ছুইটী পক্ষীকে পাঠাইয়া একটীকে তাঁর নিজ স্বর্গনিকেতনে লইলেন, আর একটী যেন যুথ-ভ্রষ্ট সঙ্গিহীন হইয়া তাঁরই অনুগমনার্থিনী হইয়া পথ চাহিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধন্য তাঁর স্বামি-ভক্তি! ধন্য তাঁর স্বামি-বিরহ! ইহাকেই ত বলে যথার্থ পতিপ্রাণা সতী।

অতঃপর দেবী সমুদয় বাহিরের খাওয়া পরা অতি কঠোর বৈরাগ্যের সহিত নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁর জীবন আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে এক প্রকার ছিল, কিন্তু স্বামীর দেহ বিচ্ছেদে দেবী পৃথিবীর সমুদয় সুখ

ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া একমাত্র ভগবানের চরণে একান্ত নির্ভর এবং আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক দিন যাপন করেন।

এক সন্ধ্যা আহার, প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া ১॥ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা উপাসনা, বহুক্ষণব্যাপী যোগ, ধ্যান, সাধন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার ইত্যাদি তাঁহার নৈমিত্তিক কার্য্য হইল। এই সময় দেবালয়ের দৈনিক উপাসনাকালে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনার পর প্রায় প্রতিদিনই তিনি অতি গভীর ভাবপূর্ণ প্রার্থনা করিতেন, এবং বিশেষ বিশেষ দিনে তিনি বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রার্থনাদি করিয়া সকলকে ভক্তিরসে বিগলিত করিতেন। এই সকল প্রার্থনার মধ্যে কিছু কিছু তাঁহার দেবকন্যাগণ সে সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সে সমুদয় পরে প্রকাশিত হইবে। আদর্শ স্বরূপ একটী প্রার্থনা আমরা এই খানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

[৯ই মার্চ্চ, ১৮৯৬] "হে প্রেমময় হরি, তোমার কাছে এত দিন এসে কিছুই যে করিতে পারিলাম না! তোমার *কাছে যাহা বলিলাম তাহাও করিলাম না। তোমার ভক্তের কাছে যাহা বলিলাম তাহাও পালন করিতে পারিলাম না।

"হৃদয়-ভূমিটা বড় শক্ত, প্রেমবৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। তোমার কৃপাবারি ভিন্ন ইহা নরম হইবে না। আমরা কেন এত অস্বাভাবিক হইলাম? এত দয়া তোমার পেয়ে তবুও হৃদয় কেন এত শুষ্ক? এই শুনিয়াছি নারীর হৃদয় কোমল, তবে কেন এ রকম অস্বাভাবিক হইলাম? কত নারীর হৃদয়ে তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। কত নারী জগতের উপকার করিতে প্রাণ দিয়াছেন। আমরা তোমার ভক্তের কাছে শিক্ষিত হইয়াও শেষে কি এই দশা হইল?

"তোমার কন্যা যাহারা বালিকা তাহাদের হৃদয়ে তোমার প্রেমফুল প্রস্ফুটিত কর।

"কেনই বা ভবে আসা? কিছুই করিতে পারিলাম না। আমি ভিতরে ত দেখি না, বাহিরেও দেখি না; যাঁরা তোমার ভক্তের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের ভিতরেও ত সে মিলন দেখিতে পাই না। কেহই ভালবাসিতে পারে না। একবিন্দু প্রেম পাব কি? এ ভব-শ্মশানে কি আর প্রেম 'সঞ্চার হইবে? যাদের শিক্ষা নাই তারা বলিতে পারে 'আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসাই যথেষ্ট, আমরা ত আর নববিধানে শিক্ষিত হই নাই। সাধু ভক্ত জীবন দেখি নাই।' কিন্তু আমরা তা আর ত বলিতে পারি না।

"এ পাপী যদি ত'রে যায় কত পাপীর আশা হবে। কৃপা করিয়া শুষ্ক হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার কর, তাহা হইলে কত লোক সুখী হইবে। যেন পরোপকার ব্রত পালন করিয়া শেষ জীবনে কৃতার্থ হইতে পারি। এই অধম সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলিয়া আশা, ভক্তি, বিশ্বাসের সহিত বার বার প্রণাম করি।"

এই সকল প্রার্থনা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, ভক্তের উপর তাঁর কি অটল বিশ্বাস এবং ভক্তি ছিল এবং ভক্তের অনুগমনে তাঁর প্রাণ কতই ব্যাকুল।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমরা দু'জন এক জন হইলাম। সংসার আমাদের চায় না। বন্ধুরা চাহিলে আসিতেন সঙ্গে, এক নৌকায় যাইবার কথা ছিল, তা ত হইল না। আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে চলিলাম।" বাস্তবিক ইহার কি অর্থ এই নয় যে কেহই আর তাঁর যথার্থ পূর্ণ সঙ্গী হইলেন না, কেবল এই একজন হইলেন? তাই সতী যেন ব্রহ্মানন্দের অনুচরদিগকে কেমন করিয়া ব্রহ্মানন্দের অনুগমন করিতে হয়, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে "একাত্মতা" সাধন করিতে হয়, "এক নৌকায় যাইতে হয়", তাহাই দেখাইবার জন্য চতুর্দ্দশ

বৎসর কাল দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং এই কাল মধ্যে তাহারই সাধনা দেখাইয়া গেলেন।

তিনি এই সময়ে আত্মজীবনের মহত্ত্ব কত ভাবেই প্রদর্শন করেন। তাহার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি সুযোগ পাইলে বাটীর দাসীগণকে লইয়াও উপাসনা করিতেন ও তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেন। পাশ্চত্যদেশের কোন কোন সংবাদপত্র তাঁহার এই মহৎ হৃদয়ের কতই প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন।

শ্রী আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর দেবী জগন্মোহিনীর পাগলিনী মূর্ত্তি ও আর্ত্তনাদ কেহ ভুলিবে না। সে অসহ্য তুর্ব্বহনীয় শোক ভার কেবল যোগ বলেই তিনি বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছাদের উপর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে অর্দ্ধ দিবস কখনও রাত্রি পর্য্যন্ত যোগে মগ্ন থাকিতেন। সেই অবধি শারিরীক সুখ স্বচ্ছন্দতা আহার বিহারে জলাঞ্জলি দিয়া কঠিন বৈরাগ্যের জীবন ধরিলেন। কঠিন তক্তাপোষে শয়ন ও স্বহস্তে ত রন্ধন করিতেনই, কখন কখনও একাহারেও দিন কাটাইতেন।

তাঁহার হৃদয়েও আচার্য্যদেবের ন্যায় নিত্য নব ভাবের উদয় হইত। একদা তাঁহার এক কন্যাকে মঙ্গলপাড়ার

গৃহে গৃহে মুষ্টি ভিক্ষা করিতে পাঠান এবং তৎপরে সেই চাউল রন্ধন করিয়া আহার করেন।

এই সময় হইতে দেবী জগন্মোহিনী নববিধানের সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি সুনিয়মে পালন করিয়াছেন। "নিশান বরণ," "আর্য্যনারী সমাজ," "আনন্দবাজার" প্রভৃতি উৎসবের কোন কার্য্যই এই চৌদ্দ বৎসর বন্ধ হয় নাই। দেবী জলন্ত উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া ধর্ম্মের কথা বলিতেন। প্রার্থনা কালে তাঁহার মুখে কি স্বর্গীয় দীপ্তিই বিকশিত হইত। সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে তাহার আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।

"নিশান বরণের" সময় সতী শুভ্র বসনে সজ্জিত হইয়া যখন নীচে নামিতেন ও সেই জ্বলন্ত ভাবে প্রার্থনা করিতেন, তখন বাস্তবিকই মনে হইত ইহা পৃথিবীর ব্যাপার নয়, এ নিশ্চয়ই স্বর্গের শোভা। শ্রীব্রহ্মানন্দের বলই সে ক্ষীণ কণ্ঠকে এত তেজস্বী করিয়াছে। কোন ইংরাজ মহিলা এই দৃশ্য দেখিয়া একবার বলিয়াছিলেন "আমি তাঁর মুখের জ্যোতিঃ ও কণ্ঠের স্বর শুনে অবাক্ হইয়াছি।" কি সুন্দর দৃশ্য! এখনও সে দৃশ্য মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

তিনি নিত্য নব ভাবে নব নব সঙ্গীত রচনা করিতেন।

কলিকাতায় অবস্থান কালে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কন্যাগণ সহ নবসংহিতার আদেশানুসারে ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। কন্যাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই উৎসাহ প্রদান করিতেন।

সন্তানগণকে লইয়া তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নব-সংহিতা বা আচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ করিতেন ; কখন কখনও সৎপ্রসঙ্গাদিও করিতেন। কখন কখনও অতি প্রত্যুষে কন্যাগণ সহ মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতেন। আর্য্য-নারী সমাজে কতই নূতন নূতন নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করিতেন, কতই নূতন নূতন আশার কথা বলিতেন। ব্রাহ্মিকাগণ ভদ্র গৃহস্থ গৃহে গিয়া যাহাতে ধর্ম্ম প্রচার করেন এমন ব্যবস্থাও করেন। কোন ভগ্নী শোকার্ত্ত হইলে তাহাকে সঙ্গীত প্রার্থনাদি শ্রবণ করাইবার জন্য আপন কন্যাদিগকে প্রচারক মহিলাসহ প্রেরণ করিতেন। ইদানীন্তন শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হওয়াতে তিনি নিজে সকল স্থানে যাইতে পারিতেন না।

উৎসবাদি সময়ে তিনি কোন কোন মহিলাকে দীক্ষা দানও করিতেন। কোচবিহারে গিয়াও একটী মহিলাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

সতীর হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা শুনিয়া পুরাতন বৃদ্ধা দাসীও প্রার্থনার সময় একবার যথেষ্ট ক্রন্দন করিয়াছিল। সেই পুরাতন দাসী যখন পরলোকে যায়, দেবী দেবালয়ে তার আত্মার জন্যও প্রার্থনা করেন। তাঁহার কথায়, ভাবে, চরিত্রে কি যে এক মধুরতা ছিল, তাহা বলা যায় না। তাঁহাকে যে সকল ব্যক্তি দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ মা, কেহ বন্ধু, কেহ গুরুপত্নী বলিয়া সম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারিত না।

দেবী তাঁহার প্রত্যেক সন্তান সন্ততির জন্ম দিনে দেবালয়ে অতি সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা সকল করিতেন। নিজের জন্মদিনে একবার প্রার্থনায় পাঁচটি পুত্রকে ও পাঁচটি কন্যাকে আমার "পাঁচটি পিতা ও পাঁচটি মাতা" বলিয়া সম্বোধন করেন।

তিনি এক সময় প্রচার যাত্রা করেন। দুই তিনটী মাত্র সঙ্গিনী সঙ্গে লইয়া অতি গুপ্তভাবে গমন করিয়াছিলেন।

সতী প্রচারক পত্নী ও অন্যান্য সঙ্গিনীগণকে সঙ্গে লইয়া কত দিনই সমস্ত রাত্রি অতি উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন, গান ও উপাসনাতে রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইতেন। বালিকা ও যুবতীদিগকে লইয়াও তিনি

স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করিতেন এবং সৎশিক্ষা দিতেন। তিনি বর্ত্তমান যুগে নারীগণের যথার্থই নেতৃ-স্বরূপা ছিলেন।

এক সময় তাঁর একটি প্রতিবেশিনী তাঁর রন্ধনের সময় অপরিষ্কার করিয়া বাম হস্তে মসলা তুলিয়া দিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁর পুত্রবধূ বলিলেন, "মা দেখ, তোমাকে এত অপরিষ্কার করে খেতে দিলে!" দেবী তাহাতে বলিলেন, "যে আমাকে ভক্তিভাবে যা দেয়, আমি তাই খাই। এতে আমার ঘৃণা নাই।" তাঁহার আহার অবশ্যই অতি সাত্ত্বিক ছিল। যদিও আহার সামগ্রী অতি সামান্য রকমেরই, কিন্তু সকল দ্রব্যই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সতী একবার স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বৃহৎ জলাশয়ে অনেকগুলি স্ত্রীলোক সন্তরণ করিতেছে। কেহ কেহ একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ডুব দিতেছে, কেহ কেহ বারি-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধা, বিধবা ও প্রৌঢ়াবস্থার স্ত্রীলোক অনেক। তিনি বলেন "দেখিলাম নদীতটে অল্প জল মধ্যে বসিয়া ভক্তমাতা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভগবানের স্তুতি বন্দনা করিতেছেন। এক পাশে আমি, আর এক পাশে অন্য

একটী স্ত্রীলোক, আমরা উভয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলাম। যাঁরা দেহ নাশ কর্‌তে যাচ্ছিলেন, তাঁদের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞায় ভক্ত বল্লেন, 'ঈশ্বর বলেন যে, মানুষেরা দেহের প্রতি এ প্রকার ব্যবহার কেন করে? আমার দেহ, আমি তাতে বাস করি, তাঁদের আত্মা আমার আত্মার সহিত মিলিত।' "

বাস্তবিক, শ্রীব্রহ্মানন্দের দেহ-সঙ্গচ্যুত হইলেও সতী যতদিন দেহে ছিলেন ততদিন প্রাণপতিকে প্রাণে নিত্য জাগ্রতরূপে রাখিয়া তাঁর অনুগমনে সাধন ভজন ধ্যান যোগ উপাসনাতেই দিন যাপন করিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধন বিনা যেন তাঁর অন্য কর্ম্ম প্রায় কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ ব্রহ্মানন্দের অনুগমন সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইতেই তিনি যেন স্বামীর বাহ্যসঙ্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে কয় বৎসর থাকিতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাই সম্যকরূপে আপন জীবন দ্বারা প্রদর্শন করিয়া স্বর্গে স্বামিসঙ্গে গিয়া পুনর্মিলিত হইলেন ইহা বলা বাহুল্য।



সতীদেবীর পীড়া ও মহাপ্রয়াণ

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে "ডাইবিটিস" রোগে দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহার জীবিতাবস্থা হইতেই দেবী জগন্মোহিনীও সেই "ডাইবিটিস" রোগাক্রান্ত হন এবং ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া ঐ রোগে বহু কষ্ট পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। মধ্যে মধ্যে এমনও সময় গিয়াছে যখন তাঁহার প্রাণের আশা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু অনন্ত কৃপাময়ের কৃপায় সে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া পৃথিবীর উপকারার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দের অনুগমন সাধনের জন্যই তাঁহার স্বর্গারোহণের পর চৌদ্দ বৎসর কাল সতী এ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সতী চক্ষু রোগেও অত্যন্ত কষ্ট পান। তাঁহার সে যন্ত্রণা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

দেবী জগন্মোহিনীকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহারাই জানেন যে তিনি কখনও অন্ধকার ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন গৃহের আলোক নির্ব্বাণ হইলেই তাঁহার প্রাণ হাঁপ হাঁপ করিত। তাই একবার যখন তাঁহার চক্ষের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল, ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত

ভীত হইলেন, একেবারে দৃষ্টি বন্ধ হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। দেবীর মনেও সেই ভয় হইয়াছিল। যদিও সে পীড়া তখনকার জন্য আরাম হইল, কিন্তু তাহার পর হইতেই দৃষ্টি ঝাপসা ও অস্পষ্ট হইল এবং ক্রমেই দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে লাগিল; আর নিজে লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। পরিশেষে দৃষ্টি এতই ক্ষীণ হইয়া আসিল যে আহারীয় দ্রব্য ও গৃহের দ্রব্য পর্য্যন্ত সব অস্পষ্ট দেখিতেন।

যিনি এক দণ্ড অন্ধকার গৃহে থাকিলে চীৎকার করিয়া উঠিতেন, তাঁহার এইরূপ অবস্থায় কতই না কষ্ট হইত। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বাস। এক সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন "ঠাকুর বাহিরের দৃষ্টি ত লইয়াছ এখন ভিতরের দৃষ্টিতে স্বর্গের ছবি দেখাও।" দৃষ্টি ক্ষীণ হইবার পর হইতে যেন জীবিত থাকিতে তাঁর আর ইচ্ছা ছিল না মনে হইত, কিন্তু তজ্জন্য অন্যের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া মৃত্যুর কথা কখনও বলিতেন না।

স্বর্গারোহণের পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে গিয়া সতীর "ডাইবিটিস" পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রাত্রিতে নিদ্রা একেবারেই হইত না, সমস্ত

রাত্রি বসিয়া কাটাইতেন। আহার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল, ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্ধ ঘরে থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। কেবল বলিতেন "সব খুলিয়া দাও"। দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতেই দেবী জানিতে পারিয়াছিলেন আর তিনি পৃথিবীতে বেশী দিন থাকিবেন না। প্রায়ই বলিতেন "বাড়ীতে গিয়া মরিব, এখান হইতে আমাকে লইয়া চল।" অসুখের পূর্ব্বেও কতবার ঐ ভাবে কথা বলিতেন, কিন্তু তখন উহার মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেপ্টেম্বর মাসে দেবী জগন্মোহিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। তখন তিনি এত দুর্ব্বল যে তাঁহার নিজে দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও ছিল না। কোন রকমে আসিয়া পৌঁছিলেন।

প্রথমতঃ সুপ্রসিদ্ধ দয়াশীলা য়ীহুদী রমণী মিসেস এজ্‌রা Mrs. Ezra তাঁহার চৌরঙ্গীস্থ সুরম্য ভবনে দেবীকে থাকিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আপনি আমার ভবনে গেলে আমার বাড়ী পবিত্র ও ধন্য হবে।" মিসেস এজরার সুন্দর ভাব দেখিয়া দেবীও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি

তাঁহাকে "কন্যা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার ঐরূপ ঔৎসুক্য দর্শনে উঁহাদিগের বাটিতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হন। দেবী জগন্মোহিনী সামান্য বিষয়ে কাহারও নিকটে উপকার পাইলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেন। একটি ফল কি একটি ফুল ভক্তির সহিত কেহ অর্পণ করিলে, কত আনন্দই প্রকাশ করিতেন। তিনি বাহিরের দান বা উপকার দেখিতেন না, কিন্তু অন্তরের ভাব দেখিতেন। মিসেস এজরা যে যথার্থই তাঁহাকে ভালবাসিতেন তাহার জন্যই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, নতুবা অন্য কোথাও কখনও তিনি থাকিতে বড় একটা ভালবাসিতেন না।

যাহাহউক ঈশ্বর-কৃপায় সেখানে থাকিয়া ক্রমেই তিনি অনেকটা আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পরে নিজ গৃহে আসিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন। তখন বর্ষাকাল, তাঁহার পক্ষে "কমলকুটীর" অস্বাস্থ্যকর হইবে বলিয়া ডাক্তারগণ আসিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেবীর মন তখন বাড়ী পানে ছুটিয়াছে। তিন সপ্তাহ মাত্র চৌরঙ্গীতে থাকিয়া আলিপুরের "উড্‌ল্যান্স" প্রাসাদে কয়েকদিন অবস্থান করেন। পরে বীরপরাক্রম জামাতা মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সীমান্ত যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন

করিলে তাঁহাকে সম্ভাষণ সূচক বরণ করিয়া গৃহে তুলিয়া লন এবং তাহার পর নিজ গৃহ "কমলকুটীরে" আগমন করেন।

তখনও সমুদয় বাড়ী মেরামৎ সমাপ্ত হয় নাই। ভূমিকম্পে অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দেবী জগন্মোহিনী আর কোথাও যাইলেন না। বহুদিন পরে নিজ গৃহ দর্শনে তাঁহার যে কত আনন্দ উৎসাহ হইল তাহা বলা যায় না। তখনই বুঝি তিনি জানিয়াছিলেন যে এ গৃহে আর বেশীদিন থাকিবেন না, বাড়ী আসিবার জন্য তাই এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। চৌরঙ্গী ভবনে বাসকালে একদা কোন এক আত্মীয়ার নিকট বলিয়াছিলেন "দেখ, এখন সর্ব্বদাই আমি তাঁকে (আচার্য্যদেবকে) খুব নিকটে অনুভব করি।" রাত্রিতে ঘুম হইত না সমুদয় রাত্রি প্রায় জাগিয়াই অতিবাহিত করিতেন।

"কমলকুটীরে" আসিবার পর হইতে সতী ক্রমেই দিন দিন সবলতা ও সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পরই প্রায় উৎসব আরম্ভ হইল। শীঘ্র এ ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বুঝি এ বৎসর এত উদ্যম উৎসাহ সহ উৎসব করিলেন।

"আর্য্যনারী সমাজে"র উৎসবে এবং "নিশান বরণে" তিনি কি জ্বলন্ত প্রার্থনাই করেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে পূর্ণ মাত্রায় যোগ দেন। সেই দুর্ব্বল শরীরে কি করিয়া যে এ সব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিতে পারি না। বলা বাহুল্য কেবল ভিতরের মনের বলেই সমুদয় করিলেন। শীঘ্র শীঘ্র যেন সকল কার্য্য শেষ করিয়া লইলেন। আর এ পৃথিবীর উৎসবে যোগ দিবেন না, সেই জন্যই বুঝি এ বৎসর এত নূতন নূতন গীত রচনা করিয়াছিলেন, এত উৎসাহ মত্ততা দেখাইয়াছিলেন ও এত প্রকার নূতন নূতন নিয়মাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সংসারের কথা বন্ধ হইবে বলিয়া বুঝি এবার সকলের সহিত এত বেশী মধুর আলাপ করিয়াছিলেন, এত স্নেহ-বাক্যে সকলের হৃদয়কে বাঁধিয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে আর দান করিবেন না বলিয়া বুঝি যে যেখানে আত্মীয় বন্ধু গরীব ছিল সকলকে এত দান করিয়া গেলেন। হায় রে, কেহই তখন জানিয়াও জানিতে পারিল না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। অবাক্ হইয়া সকলে ইহাই কেবল ভাবিতে লাগিলাম দেবী এমন শঙ্কট পীড়া হইতে উঠিয়া যখন এত পরিশ্রম এত কার্য্য করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই একেবারে সুস্থ হইয়াছেন, আর কোন ভয় নাই।

কিন্তু হায়! সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার সময় যেমন অধিকতর প্রদীপ্ত হন, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, দেবী জগন্মোহিনীর গৃহাভিমুখী আত্মা যখন জানিয়াছিলেন যে এ জগতে তাঁহার এই শেষ উৎসব তাই বুঝি এত অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন! ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় পূর্ব্ব বৎসরই বলিয়াছিলেন "এবার ভাইফোঁটা দিই, আস্‌ছে বৎসর হয়ত থাক্‌ব না", কিন্তু কেহই কিছু তখন বুঝিতে পারে নাই। এবার "আর্য্যনারী সমাজে"র উপাসনার শেষে উঠিয়াও সহাস্যে কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন "আর বৎসর দেখ্‌তে পাই, কি এই শেষ!"

এই মাঘোৎসবের পরেই ফাল্গুন মাসের প্রথমে কাল শনিসম পৃষ্ঠব্রণ "কার্বাঙ্কল" ফোঁড়া দেখা দিল। তাহা প্রথমে এত ক্ষুদ্র যে ভয়ের বলিয়া কিছুই মনে হয় নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা কি ভয়ঙ্করই হইয়া উঠিল! কি বিষম যন্ত্রণা! কি তার অসহ্য জ্বালা! প্রথম ফোড়া যখন হয় তখনই দেবী বলিয়াছিলেন "এবার লক্ষণ ভাল নয়," "এ অসুখের এই শেষ" এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন "আমার শেষ কাজ আমার ছেলেরাই করবে।

ক্রমে যখন রোগ খুব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল ও বুঝিলেন তাঁর ইহলোক হইতে যাইবার সময় উপস্থিত, তখন ভগবানেতে একান্ত নির্ভর করিয়া সেই ভীষণ যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর চিকিৎসা তেমন ভালরূপে হয় নাই। এজন্য সকলেরই বিশেষ আক্ষেপ রহিয়াছে। ডাক্তারগণ বুঝিতেও পারেন নাই যে তাঁর পীড়া এত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কেবল মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে হুহুশব্দে রোগ বাড়িয়া উঠিল এবং সে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আর কিছুতেই বিরাম হইল না। রোগ বৃদ্ধি সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা মহারাণী স্থনীতি দেবী কুচবিহারে ছিলেন। তাঁর জন্যই যেন পথ চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি কখন আসিবেন বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম অবিবাহিত তিনটী কন্যা সম্বন্ধে বলেন "এদের বিবাহ আমি আর দেখেছি।" একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া এই তিনটি অবিবাহিতা কন্যাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বলিলেন "আমি জানি আর বাঁচ্‌ব না", তাহাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেন "মা ও সব কথা বল কেন? তা'হলে আমরা চলে যাব।" তাই শুনিয়া আর একটু চুপ করিলেন। কিন্তু

তিনি সকলই বুঝিয়াছিলেন। একটি ভগ্নীকেও বলেন "পরেশ, এত কচ্ছ যদি ভাল হই তবেই তোমার পরিশ্রম সার্থক।" এইরূপে স্বর্গারোহণের কয়েক দিন পূর্ব্বে অনেক কথাই স্পষ্টরূপে বলেন।

ইহার দুই দিন পরে রবিবারে তাঁহার একটি কন্যা সুগন্ধ একটি লেবু হাতে দেন, লেবু হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, দেখিয়া দেবী বলি[illegible] " [illegible] দেখ্‌ছো ক্রমেই সব্‌ অবশ হয়ে আস্‌ছে। পোড়া হাতে আর কি জোর আছে?" তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও একটি পুত্র যিনি কুচবিহারে ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া বলেন, "বোধ হয় আর তাহাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না।" কিন্তু ভগবান ভক্ত-সতীর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন কেন? সোমবার বেলা ১২টার সময় উক্ত কন্যা ও পুত্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন দেবী বলিলেন "বেঁচে থাক, আমি চল্লাম ওরা রইল" এই মাত্র। ইহাতে মাতৃভক্তি-পরায়ণা মহারাণীরও চক্ষে জল আসিল। কন্যার অশ্রু দেখিয়া মাতারও দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল, কিন্তু তাহা তখনই মুছিলেন। আর শেষ অবধি একবারও তাঁর চক্ষে জল দেখা যায় নাই। ভগবান ও ভক্তের নাম ব্যতীত সংসারের কোন কথাই মুখে ছিল না।

যিনি একদিনও সন্তানদের চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না, একটু দূরদেশে যাইতে হইলেও কতই আকুল হইয়া পড়িতেন, তিনি অনায়াসেই একবিন্দু চক্ষের জল না ফেলিয়া বরং হাসিতে হাসিতে কন্যা পুত্র আত্মীয়দিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিলেন। ধন্য তাঁর মহাপ্রয়াণ!

সোমবার অপরাহ্ণ হইতে বিকারের লক্ষণ দেখা দিল, কিন্তু এই আশ্চর্য্য যে একবারও অচেতন হন নাই। শেষ সময় একবার "মহারাণী" বলিয়া কন্যাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু আর কিছু বলিতে পারেন নাই। তারপর দুই একবার "তোরা আয়" এই কথা বলিলেন। যখন ক্রমেই অবশ হইয়া আসিলেন তখন অতি সুকোমল সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন "মধুপুর ঐ মধুপুর! আমায় নিয়ে যাও ওগো আমাকে নিয়ে যাও!" (আচার্য্যদেবকে ওগো বলিতেন) সকরুণ স্বরে বার বার ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন। তার পর শেষ বাণী "জগৎচিন্তামণি" "জগৎচিন্তামণি" বলিতে বলিতে কথা বন্ধ হইল।

এই মহারোগের অবস্থায় "কমলকুটীরের" দ্বিতলস্থ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের প্রকোষ্ঠে, যে ঘরে পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মানন্দ

সশিষ্য বসিতেন, সেই ঘরে সতীকে রাখা হইয়াছিল। দেবীর মুমূর্ষুকালে তাঁর কন্যা পুত্রগণ ও দুই জন সাধক (পরলোকগত মধুসূদন সেন ও সেবক প্রিয়নাথ মল্লিক) ভিন্ন প্রচারক মহাশয়গণ কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা মাতৃবিয়োগে শোকাশ্রুতে ভাসিবেন, না মাকে ভগবানের নাম শুনাইবেন, কিন্তু মা জগন্মোহিনী দেবী নিজেই যেন কোন আনন্দলোকে যাইতেছেন, এই ভাবে আনন্দ মনে ইষ্ট নাম করিতে করিতে উদ্ভাসিত নেত্রে হাসিতে হাসিতে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র মার পাদোদক লইয়া ভাই ভগ্নীদের পান করিতে দিলেন।

আচার্য্যমাতা সারদাদেবী তখন মহাবার্দ্ধক্য ভারে অবনতা। তিনি সতীকে প্রাণসম স্নেহ করিতেন তাই কাঁদিয়া বলিলেন "আমার একটা বৌ আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিত সেও চলে গেল?" সতীর মাতাদেবীও কাঁদিয়া বলিলেন "আমার গরীবের ঘরের মেয়ের ভিতর এমন ফুল ফুট্‌ল সেও অকালে শুকাল?" এইরূপে কত ভাবে কত আত্মজন এবং উপকৃতগণ ক্রন্দন করিলেন ও এখনও করিতেছেন। সন্তান সন্ততিগণের বিশেষতঃ

অবিবাহিতা কন্যাত্রয়ের ক্রন্দনে যেন চারিদিক বিকম্পিত হইল, পল্লীবাসী বাসিনীগণ ও প্রচারক মহাশয়গণও অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সকলেই সতীর গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সীতা যেমন চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র সনে একাসনে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া পরম সুখী হন, সতী জগন্মোহিনী দেবীও ১৪ বৎসর এই সংসার বনবাসে বৈরাগিনী যোগিনীর বেশে সাধন ভজনে ও বৈধব্য ধর্ম্ম পালনে নিরত থাকিয়া পরমানন্দে ব্রহ্মানন্দ সনে পুনর্মিলিতা হইলেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সালের ১লা মার্চ্চ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

দেবীর প্রাণবায়ু যখন শেষ বহির্গত হইল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজপথ দিয়া এক দল সৈনিক ব্যাণ্ড্ বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলেন; তাহাতে মনে হইল যেন স্বর্গস্থ দেবদূতগণ আনন্দ বাদ্য সহকারে সতী দেবীর আত্মাকে সৎপতির সহিত পুনর্ব্বিবাহিত করিবার জন্যই এমন অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। ১৪ বৎসর যাঁর বিচ্ছেদে তিনি কাতর হইয়াছিলেন, এবং যাঁর সহিত

পুনর্ম্মিলনের জন্য প্রাণপাখী কতদিন থেকে উড়ু উড়ু করিতেছিল সন্তান সন্ততি ফেলিয়া, সোণার সংসার শূন্য করিয়া তাঁরই কাছে পুণ্যধামে তিনি আনন্দ মনে চলিয়া গেলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব মঙ্গলবারে যে সময়ে স্বর্গারোহণ করেন, প্রায় সেই সময়েই স্বাধ্বী সতীদেবীও স্বর্গধামে শান্তিধামে গমন করেন।

সতী শেষ পীড়ার অল্পদিন পূর্ব্বে এই "শান্তিধাম" সম্বন্ধে রচনা করেন :—

"শান্তিপথ হারা যারা, কোথা শান্তি পাবে তারা
ভাবিতেছে ইহা নিরবধি।
ঢাল শান্তি শান্তি বারি, অশান্তি আগুণ 'পরি,
প্রভু তুমি শান্তির জলধি।
হয়ে জীব পথশ্রান্ত, মোহে পড়ে ভুল ভ্রান্ত,
বাহিরিল শান্তি অন্বেষণে,—
"এ যে অশান্তির দেশ, নাহি হেথা শান্তিলেশ"
ডাকিয়া বলিছে সাধুগণে,
"হে পথিক যাও কোথা, শান্তি নাহি যথা তথা,
বলি শুন উপায় তোমার;
"মনোমধ্যে শান্তিপুর, তাহা নহে বহুদূর,
শান্তিসুখ পাইবে তথায়।

"নির্ব্বাণ জলধি মাঝে, অন্তঃপুর হৃদি মাঝে
শান্তিদাতা আছেন সেথায় ;
যায় প্রাণ পাপে জ্বলে, বলে 'বাঁচি মৃত্যু হলে,'
ঘোর বদ্ধ যে জন মায়ায়।
"কাঁদে যদি প্রাণ ভরে, শান্তি পাইবার তরে,
"শান্তি দাও ওহে দয়াময়!
"রাখ মার মত কোলে, প্রাণ মোর সদা জ্বলে,
দেহ ও অভয় পদাশ্রয়।'
"নিরাশ হ'য়ো না কেহ, অপার সে মাতৃস্নেহ,
—ভেদাভেদ নাই সে দয়ায়,
"অকূল সাগর-পারে, লয়ে যাইবার তরে,
একমাত্র তিনিই সহায়।"

এই শান্তিধামেই সতী সেই মাতৃস্নেহ সহায়তায় আনন্দে আরোহণ করিলেন।

১৪ বৎসর পরে আবার কমলকুটীর হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সতীহারা মাতৃহারা হইয়া জগদ্বাসীও সেই হাহাকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিল। কিন্তু স্বর্গের দেবতাগণ সতীপতির মিলনে মহাজয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সতী ত নিজ ঈপ্সিত শান্তিধামে গিয়া পতিসঙ্গ পুনরায় লাভ করিয়া পরমানন্দে ব্রহ্মানন্দেই

পূর্ণ হইলেন। এবং ব্রহ্মানন্দ-অনুগমন-ব্রত সম্যক্‌রূপে সাধন ও তাহা উদ্‌যাপন করতঃ জীবনে তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হেতু ব্রহ্মানন্দ-জননীও সতীকে নিজ স্নেহক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "এস কন্যা, বেশ হয়েছে!" ধন্য ব্রহ্মানন্দ-সতী ব্রহ্মনন্দিনী দেবী জগন্মোহিনী! ধন্য ব্রহ্মানন্দ যে তিনি এমন সতীর সহিত মিলিত হইয়া নববিধানের পূর্ণাদর্শ জগতে স্থাপন করিলেন। এবং ধন্য মা ব্রহ্মানন্দ-জননী যে ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মনন্দিনী দুইজনকে "একজন" করিয়া নববিধানে কেবল নরনারীর নয়, কিন্তু স্বর্গ এবং পৃথিবীরও মিলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মাতা জগন্মোহিনী তুমি ধন্য, তোমাকে যে সন্তানগণ মা বলিয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। তোমাকে যাঁহারা বন্ধু ও আত্মীয়া বলিয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। এবং তোমাকে যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ-বামে একবার দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও ধন্য। স্বর্গের সাধ্বী সতী কন্যা মাতৃ আদেশে ভবে দুদিনের জন্য কি খেলা করিতেই আসিয়াছিলে? এমন সাধের কানন সুন্দর পরিবার সোণার সংসার ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? মন কিন্তু কাঁদিও না, একবার দেখ দেখি দেবীর মুখোজ্যোতি। কি সুন্দর

প্রশান্ত স্বর্গীয় ভাব! কি জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি! কি অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র! স্বর্গের দেবি, তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া একবার প্রণাম করিয়া এ পাপ দেহ পবিত্র করি। এবং তোমারই আদর্শে সতীত্ব ব্রত অবলম্বনে ভক্ত-সতী হইয়া ব্রহ্মানন্দে একাঙ্গ হই ও ব্রহ্মানন্দ-জননীকে, ব্রহ্মানন্দকে এবং তাঁর নববিধানকে জীবনে জগজ্জনে যেন গৌরবান্বিত করিতে পারি।



উপসংহার ;—

সতীর জীবনের বিশেষ ভাব।

সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবন কাহিনী শেষ হইল। তাঁহার জীবনের বিশেষ ভাব ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার আরো কয়েকটী বিশেষ ভাবের কথা আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এইখানে উপসংহারে উল্লেখ করিতেছি—কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অজানিত কতই ছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহাহউক এই সকল কাহিনীর দ্বারা তাঁহার মহত্ব দেবত্ত্ব সতীত্বের পরিচয় কতক পরিমাণেও পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় তিনি স্বয়ং, আর তাঁহার পরিচয় তিনিও যথার্থ পাইয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে আত্মার চির-সঙ্গিনী বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন, "আমরা দু'জনে একজন।"

দেবী আকাশ দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। মুক্ত বাতায়নে বসিয়া, অন্ধকারনিশীথে উন্মুক্ত আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি সৌন্দর্য্য যে তিনি দেখিতেন, তাহা তিনিই জানেন। অনেক সময়ে আকাশের অসংখ্য

নক্ষত্রমালার মধ্যে আপনার ভাবুক হৃদয়ের কল্পনাতুলি লইয়া কত বিচিত্র ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতেন এবং সেই সকল চিত্র পরদিন নবদেবালয়ে পুষ্পপত্র দিয়া সুন্দররূপে চিত্রিত করিতেন। ইহা তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কি?

পুষ্পের প্রতি দেবীর কি যে একটা গূঢ় আকর্ষণ ছিল, তাহা বলা যায় না। কত সময় দেখা গিয়াছে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ বা অন্য কোন ফুল হস্তে লইয়া একমনে কতক্ষণ তন্ময় হইয়া তার মধ্যে কি দেখিতেন। ইহাতে তাঁহার গভীর সাধনশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। একটি নূতন রকমের পুষ্প এক সময় কে তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি একটি সুন্দর পদ্য রচনা করেন।

দেবীর অন্তরেও ব্রহ্মানন্দের ন্যায় নিত্য নব ভাবের উদয় হইত। একদিন প্রাতে তিনি ভাণ্ডারে বসিয়া তাঁর এক কন্যাকে বলেন, "একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বে কি?" ইহাতে কন্যা বলিলেন "পার্‌ব"। ব্রহ্মানন্দের ন্যায় তিনিও সন্তানদের অনেক সময় এই ভাবে "কর্‌বে কি," "পার্‌বে কি" বলিয়া কথা কহিতেন, কখনও আদেশ করিতেন না। যাহাহউক এই সামান্য

উত্তরটী পাইয়া তাঁর বড় আনন্দ হইল। তখন তিনি বলিলেন "আজ আমার একটি ভাব মনে হয়েছে, তুমি একটি ভিক্ষার ঝুলি করে মঙ্গলপাড়ায় গিয়ে প্রত্যেক বাড়ী থেকে একমুষ্টি মাত্র (অধিক নয়) চা'ল ভিক্ষা নিয়ে এস।" ভিক্ষা দিবার সময় কোন কোন মহিলা দেবীর এই স্বর্গীয় ভাব মনে করিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই, ব্যাকুলহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষা দান করেন। সে দিবস সেই ভিক্ষার অন্নেই দেবীর আহার হয়। একথা আমরা ইতি পূর্ব্বেও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ণ দীনতা ভিন্ন আর কিসে এরূপ ভাব প্রণোদিত হয়?

সতী চিরদিন সরলা বালিকার ন্যায় ছিলেন। অধিক বয়স হইলেও বালিকার ন্যায় অনেক সময় ভূতের গল্প ও নানা প্রকার গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। আচার্য্যদেবের বয়স সম্বন্ধে একবার কথা কহিতে কহিতে বলেন "ওঁর বয়স আর কত হবে ৭০ হবে আর কত!" সকলের প্রতি সমান ভালবাসা সম্বন্ধে বলেন "শুকোকে (করুণা) যেমন ভালবাসি কিন্তু চাকরকে তেমন বাস্‌তে পারি না, তবে কোন ব্রাহ্ম ছেলেতে আর শুকোতে কিছু তফাৎ বলেও মনে হয় না।" কি তাঁহার সরল ভাব ও ভালবাসা!

নববিধান-প্রচারক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় সতীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, সতীও ঠিক তাঁহাকে সন্তানের মতই স্নেহ করিতেন। প্রচারক মহাশয়ের বিবাহের সময় সন্তানের বিবাহে মা যেমন করিয়া বরণ করিয়া বর কন্যাকে গ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বরাবরই তাঁহা-দিগকে পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় আদর যত্ন করিতেন।

সতীদেবীর উপাসনা সঙ্গীত অতীব হৃদয়গ্রাহী ছিল। নিত্য নব নব ভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করিতেন। তাঁহার রচিত অনেক গুলি সুন্দর সঙ্গীত আছে। তেমন সুমিষ্ট স্বর আমরা আর প্রায় শুনি নাই ; তাঁহার গলার স্বর এত মধুর ছিল যে একটি গীত শুনিলে আরও শুনিবার জন্য সত্যই সবার ব্যাকুলতা হইত।

প্রতি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যাকালে মহিলা-গণকে লইয়া তিনি উপাসনা করিতেন। স্বামী পুত্র কন্যা ভুলিয়া সংসার ভুলিয়া প্রচারক পত্নীগণ সঙ্গে ছাদের উপরে বসিয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ইহা দেখিয়া শ্রীআচার্য্যদেবও কত সময় আনন্দের হাসি হাসিতেন।

"চিরবসন্তে সরস সাধুর জীবনের" ন্যায় দেবীর হৃদয়ও চির নবীন ভাবে পূর্ণ ছিল। কতই নূতন ভাব, নূতন কার্য্য তাঁর মনে উদয় হইত। শুষ্কতা, নীরস ভাব একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। কখনও একভাবে নীরস মুখস্থ উপাসনা ভালবাসিতেন না। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে শুষ্কতা আসিবার সম্ভাবনাও থাকিত না। নিত্য নব নব ভাব লইয়া শ্রীহরিচরণ পূজা করিয়া নিজে কতই সুখী হইতেন, আর সকলের অন্তরেও কত আশা আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিতেন।

এক সময় তিনি উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম করেন যে এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন এক একটি স্বরূপের আরাধনা হইবে; এবং সেই ভাবেরই সমস্ত উপাসনা হইবে। অবশ্য দেবী নিজেই উপাসনা করিয়াছিলেন। সে কয়দিবস যাঁহারা তাঁর সঙ্গে উপাসনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যেন কোন একটি তীর্থস্থানে যাইতেছেন। বাস্তবিকই সে কয়দিন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত তীর্থযাত্রা হইয়াছিল। দেবীও এরূপ বলিয়াছিলেন "যা'রা সমস্ত উপাসনা নিয়মিতরূপে যোগ দিয়াছে তা'দের সঙ্গে বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়েছে।"

আর এক সময় বলেন, "এক একটি বিশেষ চিহ্ন আমাদের থাকা উচিত।" এই বলিয়া একটি পীতবর্ণের ফিতায় তাঁর এক কন্যাকে দিয়া "নববিধান" লিখাইয়া উহা প্রতিদিন উপাসনার সময় বক্ষের উপর পরিধান করিতেন। তাঁহার নববিধানে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ইহা কি বিশেষ পরিচয় নয়?

উৎসাহ তাঁহার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রচারক পরিবারস্থ মহিলা ও কন্যাগণ লইয়া কতই নূতন নূতন কার্য্য প্রণালী ও সাধন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। ধর্ম্মালোচনা ও সৎ প্রসঙ্গাদিতে কত সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটাইতেন। কীর্ত্তনাদি সঙ্গীত বড়ই ভালবাসিতেন। ভাবের ভাবুক কাহাকেও পাইলে সকল ভুলিয়া কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গেই কতক্ষণ কাটাইতেন। মেয়েদের মধ্যে প্রচার কেবল দেবীর জীবনেই প্রথমে দেখা যায়। ভদ্র পরিবারস্থ মহিলাগণের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং এই কার্য্যে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন।

তিনি নিজে দুই একটি মহিলাসহ এরূপ প্রচারে যাইতেন; মাঝে মাঝে সময় পাইলে বাগানাদিতে গিয়াও উপাসনাদি করিতেন। কিন্তু শরীর যখন নিতান্ত

অসুস্থ হইল, তখন "আর্য্যনারী সমাজের" কয়েকটি মহিলার প্রতি এই ভার প্রদান করেন। কোথাও কাহারও গৃহে শোকের ক্রন্দন উঠিয়াছে শুনিলে সে স্থানে গিয়া উপাসনাদি করিয়া সকলের অন্তরে সান্ত্বনা দান, ভদ্রমহিলাদিগের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গাদি করিয়া ঈশ্বরের দিকে মন ফিরাইবার চেষ্টা এই সকলই এ কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। দেবী সকল সৎকার্য্যই প্রায় গোপনে করিতেন, সে জন্য তাঁর জীবনের সকল ঘটনা অনেকেই প্রায় জানেন না।

তিনি বড় লজ্জাশীলা ছিলেন। প্রচার ইত্যাদির নিয়মাদি করেন, কিন্তু সমুদয় কার্য্য মধ্যে নারীর কোমলতা ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া যতদূর কার্য্য করা যায় তাহাই করিতে বলিতেন। পুরুষোচিত কর্ম্ম ও স্বাধীনতা নারীদিগের আচার ব্যবহারে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। আদর্শ নারীচরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি অনেক বারই সকলকে উপদেশ দিতেন।

দেবী দুর্নীতি পাপ একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সেই স্বর্গীয় স্বাভাবিক পুণ্যের তেজের সংস্পর্শে যে আসিয়াছে সেই জানে দেবীর জীবনে পবিত্রতার প্রতিভা সর্ব্বক্ষণ আপন প্রভা বিস্তার করিয়া

কেমন কার্য্য করিত! দেবী কিছু না বলিলেও অন্যায় করিয়া তাঁহার সম্মুখে কেহ যাইতে সাহস করিত না। দেবীর হৃদয়ে যেমন অতুল স্নেহরাশি ছিল, আবার সেই হৃদয়েই অন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ও তীব্র শাসন ছিল। তিনি কাহাকেও কখনও বেশী তিরস্কার বা কঠিন দণ্ড দিতেন না সত্য, কিন্তু কিছু অন্যায় দেখিলে এরূপ অসন্তোষের ভাব দেখাইতেন যে, সহজেই সন্তানেরা বুঝিতে পারিতেন। কন্যাদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ সতর্কতা ছিল। সামান্য মাত্রও বাহুল্যতা তিনি ভালবাসিতেন না। নীতি সম্বন্ধে একটু-মাত্র শৈথিল্য দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার শাসন সর্ব্বদাই স্নেহমিশ্রিত ছিল, তাই সন্তানগণ মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ভাবিলে দুঃখে অধীর হইতেন।

অন্যায় দেখিলে দেবী যেমন বিরক্ত হইতেন, আবার সামান্য সৎকার্য্যে কাহারও অনুরাগ দেখিলে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। দেবী অপর সাধারণ জননীর ন্যায় ছিলেন না। সন্তানদিগের মধ্যে যদি ধর্ম্মনিষ্ঠা বা বৈরাগ্য দেখিতেন,—যাহা স্বাভাবিক ও যথার্থ ধর্ম্মানুরাগ সম্ভূত,—তাহাতে কখনও বাধা দিতেন না, বরং সে বিষয়ে যারপর নাই সহায়তা করিতেন। সন্তানদের সকলকে

লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কাহারও মধ্যে কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন-ভাব পছন্দ করিতেন না। শৈশব হইতে সন্তানগণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহজ ভাষায় উপাসনা ও যাহাতে তাঁহাদের শিশু-অন্তর সহজে উপলব্ধি করিতে পারে এমন ভাবে উপদেশ দিতেন। ব্রতাদি গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। সকল জননীই সন্তানদিগকে বসন ভূষণে সাজাইতে ভালবাসেন, কিন্তু জননী জগন্মোহিনী যথার্থই সন্তানদিগকে কিসে ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিবেন তাহারই জন্য সদা ব্যস্ত ছিলেন। বাস্তবিক দেবী জগন্মোহিনী অপর সাধারণ জননীর ন্যায় ছিলেন না।

অন্যায় আমোদ বা অতিরিক্ত আমোদ কখনও দেবী কাহারও সম্বন্ধে প্রশ্রয় দিতেন না। নিজ কন্যাদিগকে বলিতেন মেয়েদের খুব সাবধানে থাকা উচিত। "কাজ মন্দ না হ'লেও যাহা দেখ্‌তে ভাল নয় তাহাও করা উচিত নয়" এইরূপ কতই উপদেশ দিতেন। এমন করিয়া কয়জন মা কন্যাদের সুশিক্ষা দিয়া উচ্চ চরিত্র গঠনে সহায়তা করেন?

অনেক মাতা প্রাণের অধিক সন্তানদিগকে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন সত্য, কিন্তু দেবী জগন্মোহিনীর সন্তান-স্নেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে স্নেহ যেমন সুকোমল সুমধুর তেমনি সুশাসন-মিশ্রিত। সন্তানগণের সঙ্গে যেমন হাসি আমোদ করিতেন, তেমনি একটু অন্যায় দেখিলে অত্যন্ত শাসন করিতেন। শাসনও আবার প্রহার বা শারীরিক কষ্ট প্রদান নয়, কিন্তু দু একটি কথা বা চক্ষের দৃষ্টিই তাঁহার শাসন ছিল। সন্তানগণের কাছে তেমন বন্ধুও আর কেহ নাই। দুঃখ কষ্ট পরীক্ষায় পড়িয়া সন্তানগণ মাতার কাছে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া প্রাণের ব্যথা জানাইয়া কতই সুখী হইত। তিনি নিজের কষ্ট কখনও সন্তান-দিগকে বলিতেন না। সন্তানদিগের কষ্ট কিন্তু কখনও দেখিতে পারিতেন না। তেমন স্নেহময়ী জননী কি আর কাহারও হয়? তাঁহার দেবকন্যাগণ সকলেই সুশিক্ষিতা ও বহু সদ্‌গুণ-সম্পন্না সন্দেহ নাই। তথাপি কন্যাগণের জীবনে যাহা কিছু প্রশংসনীয় তাহার অধিকাংশই যে সেই স্বর্গীয়া সতী সাধ্বীরই গুণে ইহা বলা বাহুল্য।

দেবী পুত্র, কন্যা, বধূ, জামাতা, দৌহিত্র ও পৌত্র, সকলকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। স্বহস্তে কত রকম ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। তাঁহার অতি

অল্প বয়সেই ভগবান্ সুন্দর রূপে সংসার সাজাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যদেবের দেহের অবর্ত্তমানে দেবী কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতেন না। কেবল বলিতেন, "তিনি যদি দেখিতেন, কত আনন্দ করিতেন।"

আপন পুত্রকন্যাদের প্রতি যেমন বধূর প্রতিও ততোধিক না হউক কিছুই কম স্নেহ করিতেন না। বধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের পর সতী যে প্রার্থনা করেন তাহাতেই তাঁহার প্রতি তাঁর প্রাণের কত গভীর স্নেহ ছিল বুঝা যাইবে, এই জন্য এই প্রার্থনাংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"হে স্নেহময়ী জননি, বিপদের সময় তোমাকে দয়াময়ী ব'লে ডাক্‌তে হয়। তুমি যে দয়াময়ী তবে কেন এ নিষ্ঠুরের কাজ কর্‌লে? আজ তোমার ভক্ত পরিবার দুঃখে ম্লান, তুমি ভিন্ন কে আর তাদের চক্ষের জল মুছাইয়া দিবে? তুমি নববিধানের উপযুক্ত বৌ করিয়া পাঠাইয়াছিলে, আবার তাকে লইয়া গেলে? তাঁর সুন্দর দেহ কেবল চক্ষের সম্মুখে ভাস্‌ছে। বৌ সকল দিকেই আমার সঙ্গিনী ছিলেন। ঝাঁটা ধরিয়া দাসীর কাজও করিয়াছেন, রাজ সমাজে মিশিয়াছেন, রোগে সেবা করিয়াছেন। ভক্ত তাঁকে বড় ভালবাসিতেন সে

যে ভক্তের অতি প্রিয়। বালিকা অবস্থা হইতে তাঁর এ পরিবারে বিশেষ ভক্তি ভালবাসা ছিল। তখন হইতে তাঁকে বড় ভালবাসিতাম। সে যে আমার সঙ্গের সঙ্গিনী ছিল। মা, সে সতী লক্ষ্মী, তুমি তাকে লইয়া গেলে? তার সম্বন্ধে যত ত্রুটি হয়েছে ক্ষমা কর। সে যখন এ পরিবারে আসে তখন কত বাধা পাইল, তথাপি সে নিজের গুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়া সকলের প্রিয় পাত্রী হয়েছিল। মা, সে আত্মা তোমার কোলেরই উপযুক্ত, তাই রাখ তাঁকে সুখে ভক্ত সঙ্গে।" ধন্য সতীর স্নেহ!

সকল ঘটনার ভিতর হইতে উচ্চভাব উদ্ভাবন, মানবের ভিতর দেবভাব দর্শন সতীর এক বিশেষ লক্ষণ ছিল। এক সময় শ্রীমৎ কুচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পূণ্যাহের সময় যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই সময় দেবী মহারাজার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "এই পূণ্যাহ দেখে আমার একটি ভাব মনে হইতেছে। যেমন বিশ্বরাজ ভগবান তাঁর সামান্য নরনারীদিগকে অতুল ধন, প্রেম, পূণ্য, বিশ্বাস, ভক্তি দিয়াছেন, আবার তাহা হইতে কিছু কিছু ভক্তি বিশ্বাস ভক্তের নিকট হইতে লন, তেমনই এই যে ইনি দেশের মহারাজা হয়ে প্রজাদিগকে অনেক

ধনরত্ন দিয়াছেন, কিন্তু ইহাদিগের নিকট হইতে আবার কিছু কিছু যৎসামান্য নজর লইতেছেন।” কি সুন্দরই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ছিল।

সাজসজ্জার দিকে জগন্মোহিনীর কখনই দৃষ্টি ছিল না। অন্যান্য সমবয়স্কাগণও যখন সাজসজ্জা করিত, সে সকল তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি অতি সামান্য রকমের বেশভূষাই পছন্দ করিতেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই তিনি ভালবাসিতেন, কিন্তু বিলাসিতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। বিলাসিতা ও সাজসজ্জার প্রতি সতীর এরূপ ঘৃণা তাঁহার মহাবৈরাগ্যেরই পরিচায়ক। তা’ছাড়া তাঁহার এরূপ ভাব যদি না হইত ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আরো বিলাসিতা ও সাজসজ্জার প্রতি লোভ যে কতই বাড়িত তাহা বলা যায় না। তাঁহার মহদ্দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে সকল নারীরই অনুকরণীয়।

তাঁহার বিশেষ স্বর্গীয় ভাব তাঁহার পবিত্রতা ও সতীত্ব। কি সতীত্বের তেজ, কি পুণ্যপ্রভাই তাঁহার সুন্দর মুখ সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত করিয়া রাখিত। তাঁহাকে দেশভ্রমণকালে অনেক সময়ে একা একা থাকিতে হইত, তজ্জন্য আচার্য্যদেবের নিকটে কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে বলেন; কিন্তু

তাহাতে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "ইনি যদি অসচ্চরিত্রা নারীদিগের নিকটেও বাস করেন, তথাপি আমি কখনও অবিশ্বাস বা সন্দেহ কর্‌তে পারি না; কারণ আমি জানি, ইনি কত সতী"। তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে, নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক তথায় আসিয়া জোটেন, তখন স্ত্রীজাতির উন্নতি, ব্রাহ্মিকা হওয়া আর পুরাতন রীতি নীতি নিয়মাদি সকলই উৎপাটন করা এই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। কপালে সিন্দূর, হাতে লোহা, সকলই কুসংস্কার বলিয়া তখন পরিগণিত ছিল। কিন্তু অন্য লোকে এরূপ দেশাচার ও পদ্ধতি উল্টাইয়া দিলেও দেবী জগন্মোহিনী সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না, কিম্বা তাহাতে যোগও দিতেন না, তাহাতে অনেকেই তাঁহাকে কুসংস্কারাপন্না ইত্যাদি বলিত এবং সে কথা আচার্য্যদেবকেও জানাইত। কিন্তু শ্রীমৎ আচার্য্যদেব একদিনের জন্যও স্ত্রীকে সেজন্য কিছু বাধা বা তাঁহার কার্য্যে আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। দেবদত্ত যে স্বর্গীয় স্বাধীনতা জগন্মোহিনীর চরিত্রে ছিল এ স্বাধীনতাকে আচার্য্যদেব কখনও বাধা দেন নাই। তিনি ইহার মূল্য ও সমাদর জানিতেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে

তিনি পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তাই সে স্বাধীনতা তাঁহাতেও পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, এবং ইহা হইতেই যে নববিধানে কুসংস্কার-বর্জ্জিত শুদ্ধ দেশাচারের প্রতি আদর দানের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল কে অস্বীকার করিতে পারেন? সতী কুসংস্কার-সম্পন্না হইয়া যে সেরূপ করিতেন তাহা নহে, তিনি প্রকৃত সুসংস্কার শিক্ষা দিবার জন্যই অন্য মেয়েদের মত যখন যেমন স্রোত বহিত তাহার সহিত ভাসিয়া যাইতেন না। প্রকৃত স্বাধীনতা-পরায়ণা বিশ্বাসিনীরই এই সুলক্ষণ।

শ্রীব্রহ্মানন্দিনীর ন্যায় ব্রহ্মানন্দের এত অনুগামিনী আর কে? কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে তিনি কখনও অন্ধভাবে তাঁহার অনুগমন করেন নাই। হঠাৎ না বুঝিয়া স্বামীর সব কাজেই যে তিনি একেবারে যোগ দিতেন তাহা নহে, বরং প্রথম প্রথম অনেক সময় বাধাও দিতেন, তর্ক বিতর্কও করিতেন। তাঁহার এই স্বাধীন ভাবের জন্য ব্রহ্মানন্দকেও তাঁহার সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়া অনেক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত আপন মণ্ডলীর মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মসংস্কারাদি প্রবর্ত্তন করিতে হয়। তিনি আপন স্ত্রীর জীবন দেখিয়াই হিন্দুজাতীয় নারী-চরিত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইজন্যই ব্রহ্মানন্দ সতীর

সম্বন্ধে বলিয়াছেন এক সময় "ইনি বড় ব্যাঁকা" ছিলেন। আরো স্ত্রীলোকদিগকে "অবলা" বলিলে, তিনি বলিতেন "কে বলে 'অবলা' আমি ত বলি যথেষ্ট "বলা।" আপন স্ত্রীর মহা স্বাধীন প্রকৃতি দেখিয়াই যে একথা বলিতেন ইহা বলা বাহুল্য। যাহাহউক ব্রহ্মানন্দিনী যথার্থই প্রকৃত স্বাধীনভাবাপন্না ছিলেন। অথচ তাঁহার স্বাধীনতা অহংকৃত স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনভাবে সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলেই আবার যেমন তাহার অধীন হইতে হয়, সতীর স্বাধীনতা সেই ভাবেরই ছিল। তিনি স্বাধীনতার সহিত ব্রহ্মানন্দের অধীন হইয়া ছিলেন। নববিধানে ব্রহ্মানন্দও যে স্বাধীন-অধীনতা শিক্ষা দিয়াছেন, সতীরও স্বভাবতঃ তাহাই জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল।

সতী লোকের দোষ অপেক্ষা সাধারণতঃ গুণের দিকই অধিক দেখিতেন। নববিধান প্রচারক-পত্নীগণের দোষ দুর্ব্বলতা অনেক সময়ই যথেষ্ট বাহির হইত, কিন্তু তাঁহারা যে স্বামী অনুগমনের জন্য ঘরবাড়ী আত্মীয় কুটুম্ব, এমন কি কিছু কিছু বিষয় বৈভবও ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এই ত্যাগের জন্য সতী তাঁহাদিগকে যথেষ্টই সম্মান করিতেন। সহস্র দোষ দুর্ব্বলতা স্বত্ত্বেও তাঁহাদের এই ত্যাগের জন্য যে তাঁহারা যথার্থ ই সম্মানার্হ, হায়! কয়জন

এখন সে ভাবে তাঁহাদিগকে এবং অপর সকলকে দেখিতে পারেন ?

দেবী স্বাভাবিক বড় গরীব ছিলেন ; নিজের জন্য কিছু-মাত্র ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন না। দীন দুঃখী দিগকেই বড় ভালবাসিতেন ও দয়া করিতেন। দানে কখনও তিনি পরাঙ্মুখী ছিলেন না। অন্ন বস্ত্র ঘরে যাহা থাকিত যাহাদের সে সকলের অভাব তাহাদিগকে দিয়া সতী সুখী হইতেন। বিদেশে গিয়াও পরের জন্য ভাবিতেন। এক সময় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট এলাহাবাদে গমন করেন এবং তথায় নানা সামগ্রীর অপচয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মঙ্গলপাড়ার ছেলেরা খেতে পায় না, আহা তাদের যদি এসব দিতে পারতাম!" সত্য সত্যই তথা হইতে আসিবার সময় কত প্রকার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিয়া মঙ্গলপাড়ার সন্তান-দিগকে দিয়াছিলেন। বাস্তবিক কেহই বলিতে পারিবেন না যে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া কোন ব্যক্তি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সংসারে অসচ্ছলতা হইলেও কেহ ভিক্ষা চাহিতে আসিলে তাহাকে কখনও তিনি ফিরাইয়া দিতেন না। পর দুঃখে কাতরা নারী তাঁহার মত সত্যই প্রায় দেখা যায় না।

পিত্রালয়ে, মাতুলালয়ে, শ্বশুরালয়ে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে যে কেহ হউক না দেবী জগন্মোহিনীর স্নেহ এবং দয়ায় সকলেই মুগ্ধ। কারণ কাহারও দুঃখের কথা শুনিলেই তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইত।

পরোপকার দেবীর জীবনের একটী প্রধান অঙ্গ। পরদুঃখে এমন কাতর হইতে, পরকে স্নেহ দ্বারা এমন আপনার করিয়া লইতে প্রায় কাহাকেও দেখি নাই। দুঃখী, শোকার্ত্ত সকলেই তাঁহার নিকটে আসিয়া সাহায্য সান্ত্বনা পাইত। দেবীর দান শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে শুষ্ক হৃদয়ের দান ছিল না, তিনি যথার্থ পর দুঃখে কাতর হইয়াই দান করিতেন। তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা একটী ক্ষুদ্র বাক্স থাকিত, তাহাতে গরীবদিগের জন্য পয়সা টাকা সঞ্চিত থাকিত। ভাণ্ডারে স্বতন্ত্র একটি হাঁড়ি রাখিতেন, প্রতিদিন কিছু করিয়া চাউল তাহার ভিতরে রাখিয়া দিতেন, পরে তাহা গরীবদিগকে দান করিতেন।

তাঁহার ক্ষমাও অনন্ত ক্ষমার কণা ছিল। তাঁহাকে লোকে কি না বলিয়াছে, গালির উপর গালি, অপমানের উপর অপমান করিয়া কত কষ্টই দিয়াছে, তাঁহার কোমল হৃদয়ে কতই আঘাত করিয়াছে, তথাপি তিনি

সকল প্রকার অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কেবল ক্ষমা করিয়াছেন, ভাল বাসিয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্য তাঁহার ক্ষমা, কি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা। আমরা ইতি-পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি মহা বিরক্তির কারণ থাকিলেও তাঁহার হাস্যমুখ কখনও মলিন হইত না। ইহা সামান্য মহত্বের পরিচয় নয়।

তাঁহার আচার ব্যবহার অতি পবিত্র ও স্বাভাবিক ছিল। তিনি অতিশয় শুদ্ধাচারা ছিলেন। স্বদেশীয় পবিত্র সাত্বিক ভাবেই চির জীবন কাটাইয়াছেন। বিজাতীয় রীতি ভাব অনুকরণের তিনি নিতান্ত বিরোধিনী ছিলেন। বাস্তবিক শ্রীআচার্য্যদেব-পত্নী যদি এমন বিশুদ্ধা-চরণা পতিপ্রাণা না হইতেন তাহা হইলে বিধানা-চার্য্যদেবের ধর্ম্ম প্রচারের আরও যে কত বিঘ্ন বাধা ঘটিত সন্দেহ নাই। কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপনের প্রথম সময়ে "ব্রাহ্মিকা" নাম শুনিলে স্বভাবতঃই হিন্দু-মহিলাগণ তাহাকে এক অদ্ভূত কোন পদার্থ মনে করিতেন; লজ্জাশীলা কুলবধুগণ অন্দর মহলে থাকিয়া "ব্রাহ্মিকা" নাম শ্রবণে সহজেই ভীত ও সশঙ্কিত হইতেন।

আচার্য্যদেব যখন প্রচারার্থে সস্ত্রীক বিদেশে গমন করিতেন এবং কখন কখন হিন্দু পরিবারে অবস্থান

করিতেন, তখন তথাকার মহিলাগণ অবগুণ্ঠনবতী দেবী জগন্মোহিনীর সুন্দর কোমল ভাব ও হিন্দু কুলবধু সমুচিত সদাচার দর্শনে সকলেই মোহিত ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কতজনে তাঁহাকে যে "মা লক্ষী" বলিয়া গৃহে তুলিয়া লইতেন ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়াই হিন্দু মহিলাগণ "ব্রাহ্মিকা" নামকে ভক্তি করিতেন। কোন এক ভদ্রলোকও বলিয়াছিলেন "এত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু আচার্য্যপত্নীই এক মাত্র ভক্তি শ্রদ্ধার স্থল।" যথার্থই তিনি বর্ত্তমান যুগে হিন্দু স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিলেন এবং শ্রীব্রহ্মানন্দও তাঁহাকে সেই ভাবে দর্শন করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহা হইতে পৃথক হওয়া দূরে থাকুক, কত হিন্দু নারী তাঁহার পবিত্র ব্যবহারে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যাও হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবল অতি প্রবল ছিল। সুতরাং জীবন দ্বারা তিনি যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এমন প্রচার কয়জন নারী করিয়াছেন ?

পদ্য রচনা এবং সঙ্গীত রচনাতেই তিনি অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। শ্রীব্রহ্মানন্দের কতকগুলি সুন্দর প্রার্থনা তিনি পদ্যাকারে রচনা করিয়া "প্রেম কুসুম"

নামে প্রকাশ করেন এবং তিনি কেমন সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত সকলও রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তাঁহার শেষ রচিত তুইটী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"আয় আনন্দে আনন্দ বাজার দেখ্‌বি নয়নে।
হেথা প্রেমময়ীর প্রেমের খেলা নববিধানে।
ব্রহ্মানন্দের জীবনে, ভক্তগণের সম্মিলনে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় নববৃন্দাবনে।
ভক্ত পুত্র কন্যাগণে, রাজকুমার কুমারী সনে,
খুলেছে আনন্দময়ীর দোকান আনন্দ মনে ;
সবে মিলে প্রাণে প্রাণে প্রণমি হরির চরণে।"

আর একটী ঃ—

"জয় গান করি হরি তোমার নববিধানে।
অন্তে যেন স্থান পাই প্রভু তোমার অভয় চরণে।
ভক্তের স্বভাবে, তোমার প্রভাবে,
মিলে থাকি যেন হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে।
প্রবল সিংহের বল, আমি অতি তুর্ব্বল,
দেখ যেন পালাইনে ভীত মনে ;
ভক্তের বিশ্বাস সাহসে তোমার প্রসাদে,
শমন জয়ী হই যেন এ জীবনে।"

সতীদেবীর প্রথম যে গান ব্রাহ্মিকা সমাজে গীত হয় তাহার প্রথম আরম্ভ এই ঃ—

"আমরা তোমার কন্যা এসেছি তোমার কাছে,
বড় সাধ হয় মনে দেখিতে নয়নে—"

সতী প্রায়ই পদ্য করিয়া প্রচারক মহাশয়গণ ও প্রতিবাসিনীগণ, এমন কি আপন পুত্র কন্যাগণেরও চরিত্র অনুসারে নামকরণ করিতেন, ইহা তাঁহার এক বিশেষ আমোদের ব্যাপার ছিল। কোচবিহার রাজ পুত্র কন্যাদের সম্বন্ধে একবার তিনি এইরূপ পদ্য করেন ঃ—

"তোমরা কভাই সুন্দর সবাই,
শ্রীরাজরাজেন্দ্র অতি মনোহর,
জীতেন্দ্র, নৃত্যেন্দ্র, হিতেন্দ্র সুন্দর,
সুকৃতি ভগিনী তাহার ভিতর,
রবি শশী যেন মিলে একত্তর।"

দেবীর এইরূপ পদ্যগুলি কাহারও নিকট সংগৃহীত আছে কিনা জানিনা। সংগ্রহ থাকিলে সেগুলি প্রকাশ করিলে তাহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

স্বামী আত্মার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় সতী বালিকা অবস্থা হইতেই প্রদর্শন করিয়া

আসিয়াছেন। এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এত মহৎ হইতে পারিতেন না যদ্যপি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মেতে ও গুণেতে এরূপ অলঙ্কৃতা না হইতেন, ও তাঁহার অনুগামিনী না হইতেন।" বাস্তবিকই শ্রীআচার্য্য পত্নীর এত সদ্‌গুণ, নিরহঙ্কার ও ভগবানে নিষ্ঠা না থাকিলে তিনি আজ কখনই নারী-কুলশ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না। তাঁহার আদর্শ জীবন যে বর্ত্তমান যুগে সমুদয় নারী জীবনের নিকট বরণীয় হইবেই ইহা নিঃসন্দেহ।

দেবী জগন্মোহিনী দেবস্বামী বিয়োগের পরও যখন একাকিনী অসহায় শিশু সন্তানগুলি লইয়া কেবল ভগবানের দিকে চাহিয়া সংসার নির্ব্বাহ করেন তখনও সে জীবনের উপর দিয়া কতই পরীক্ষার প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা তাঁহার সেই প্রফুল্ল প্রশান্ত মুখ কমলে কেহ কখনও বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি দেখা যাইত। সে যে কি সুন্দর মুখ-ভরা হাসি কেবল যে দেখিয়াছে সেই জানে; রোগ যন্ত্রণা বা সহস্র পরীক্ষাও সে হাসি বন্ধ করিতে পারে নাই।

তাঁহার জীবন যথার্থই একটী সহাস্য পুষ্পের ন্যায় আনন্দময় ছিল। তিনি সদাই আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাই তাঁর নামও গোলাপ হইয়াছিল।

বাস্তবিক নারীর স্বাভাবিক শান্ত-স্বভাব ও কোমলতা, প্রকৃত স্বাধীনতা ও দীনতা-পূর্ণ ধর্ম্মানুগত্য, পরসেবা ও মহা-প্রেম, আত্মত্যাগ ও গুণগ্রাহিতা, যোগ ও সংসার পালন, নৈতিক তেজস্বিতা ও ক্ষমা, ধৈর্য্য ও শুদ্ধাচার, লজ্জাশীলতা ও দয়া, পরোপকারিতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মসাধনশীলতা, পতিপ্রাণতা ও স্বর্গীয় সন্তান-বাৎসল্য এবং সর্ব্বোপরি নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস ও ব্রহ্মানন্দসনে একাত্মা যদি কেহ একাধারে দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে দেবী জগন্মোহিনীর এই স্বর্গীয় নির্ম্মল চরিত্র দেখুন ও পাঠ করুন। আমরা বিশ্বাস করি ব্রহ্মানন্দ-অনুগমনে নববিধান-জীবন সাধনার ইহাই বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট আদর্শ জীবন-চরিত্র।

দেবী ব্রহ্মনন্দিনীর জীবনের সর্ব্বোচ্চ বিশেষত্ব তিনি ব্রহ্মানন্দের সতী। কারণ ব্রহ্মানন্দসনে যুগলমিলনে তিনি একাঙ্গ নর এবং নারী যে দুই নয় অর্দ্ধার্দ্ধ। ব্রহ্মানন্দই বর্ত্তমান যুগে অভিব্যক্ত করেন, এবং দুই অর্দ্ধ কেমনে এক হয় সতী-সহ যুগল মিলনে তাহাই প্রমাণিত করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ত নিত্য ব্রহ্মানন্দময়, সতীর জীবন কিন্তু বাহ্যত তাহা নয়; কতই রোগ, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা স্বামী-শোক, সন্তাপ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় "ব্রহ্মানন্দ" "ব্রহ্মানন্দ" করিয়া সকলই তিনি সহ্য করিলেন এবং সকলই অতিক্রম করিয়া পরিণামে ব্রহ্মানন্দে যোগ যুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়া গেলেন। সতীত্ব সাধনের ইহাই পরিণতি।

পৃথিবীতে রোগ শোক যে থাকিবে না তাহা নয়, কিন্তু তাহা মিথ্যা ক্ষণিক মায়িক, তাহার অন্তে ব্রহ্মানন্দ-লাভ। ইহাই ত সতী দেবী জীবনে সাক্ষী দিয়া পাপ তাপ শোক দুঃখ জরা মৃত্যুময় সংসারে ব্রহ্মানন্দ-লাভের পথ দেখাইলেন এবং ইহাও দেখাইলেন ভক্ত-সতীর সতী হইয়া ভক্ত-অঙ্গে মিলিয়া অন্তে পরমপতি ব্রহ্মে কেমন করিয়া বিলীন হইতে হয়। ইহাতেই তিনি পাপী দুঃখী নরনারীর আশা-স্বরূপ হইলেন। ভক্ত-হৃদয় সতীর, সতীর হৃদয় ভক্তের এবং উভয়ের হৃদয় মহাযোগে মিলিত হইয়া ব্রহ্মের হইল, ইহাই কি ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মনন্দিনী জীবনে দেখাইলেন না। ইহাতেই ত পৃথিবীতে স্বর্গ প্রদর্শিত হইল, নববিধান পূর্ণ

হইল এবং পৃথিবী হইতে জড়, সংসার, পাপ, মোহ, জরা, মৃত্যু, রোগ শোকের প্রভাব চলিয়া গেল, বিশ্ব ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইবার উপায় হইল।

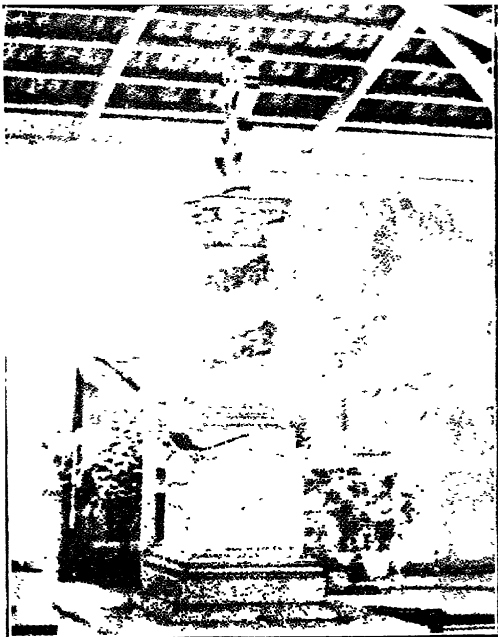
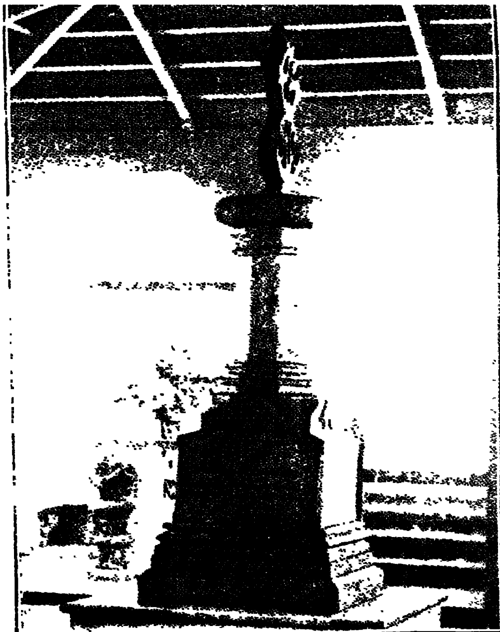
তাই বলি শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন আদর্শ-জীবন হইলেও তাহা একদিক মাত্র, ব্রহ্মনন্দিনী সহ মিলনেই, ব্রহ্মনন্দিনী সনে একাত্মতাতেই তাহার পূর্ণতা। অতএব এ জীবনাদর্শ গ্রহণ বিনা নববিধান সাধন পূর্ণ হইবে না। শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বয়ংই বলিয়াছেন "নরপ্রকৃতি অর্দ্ধ, নারী-প্রকৃতি অর্দ্ধ; এই দুই অর্দ্ধ একত্র হইলে এক হয়। যতক্ষণ এই দুই অর্দ্ধ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ প্রত্যেক অর্দ্ধ অপূর্ণ থাকে। যখন এই দুই একত্র হইয়া এক হয় তখন তাহারা পূর্ণ হয়।" সুতরাং ব্রহ্মানন্দ-ব্রহ্মনন্দিনী যে একই জন ইহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই আদর্শ অবলম্বনেই সকল নরনারীকে স্বামী স্ত্রী অর্দ্ধার্দ্ধ মাত্র জানিয়া এক হইতে হইবে ইহাই নববিধানের অভিপ্রায়। শ্রীব্রহ্মানন্দও বলেন "এই আজ্ঞা আসিয়াছে প্রত্যেকে আপন আপন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া ধর্ম্মসাধন করিবেন। দুই না হইয়া এক হও।" তাই তাঁহারই সনে প্রার্থনা আমরা "যেন যুগলরূপ সাধনের নূতন বিধি

মস্তকে ধারণ করি এবং কায়মনোবাক্যে তাহা সাধন করি।”

আরও সতী ব্রহ্মনন্দিনী যেমন ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে তাঁহার সহিত একাঙ্গ হইয়া আমিত্ব-বিহীন ও ব্রহ্মে বিলীন হইলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁহারই আদর্শে নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দের অনুগমনে তাঁহার সহিত একাঙ্গ একাত্মা হইয়া সস্ত্রীক সবান্ধবে পরস্পরের সহিত একাত্মতা লাভ করি ও অন্তে ব্রহ্মে আত্মবিলীন হইয়া নববিধান পূর্ণ করি। শ্রীব্রহ্মানন্দও যে প্রার্থনা করিলেন—“লেখা ছিল শাস্ত্রে একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য” তাহাই যেন আমরা পূর্ণ করিতে পারি। সতী ব্রহ্মনন্দিনী জগন্মোহিনী দেবীর এই আদর্শ জীবন তাহারই সহায় হউক এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দিব্য-আত্মা স্বর্গ এবং মর্ত্তে নিত্য গৌরবান্বিত হউক।



সম্পূর্ণ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর সমাধি।

পরিশিষ্ট।

—:o:—

স্বর্গীয়া শ্রীআচার্য্য-পত্নী দেবী ব্রহ্মানন্দিনী লিখিত কয়েকটি ধর্ম্ম কথা।

১। মন যখন ভাল থাকে শয়নে স্বপনে তোমায় দেখে।

২। মানব আত্মার প্রার্থনা ঠিক বাষ্পের মত। তেমনি উচ্চ দিকে ঈশ্বর চরণে উঠিতেছে এই পৃথিবীর যত নর নারীর প্রার্থনা। বাষ্পের গতি যেমন ঊর্দ্ধদিকে, বাষ্প সকল যেমন আকাশ মার্গে জমাট বাঁধিয়া ভয়ানক শক্তি প্রকাশ করে, পৃথিবীর উত্তপ্ত ভূমিকে উর্ব্বরা করে ও বজ্রনিনাদ করে বিদ্যুৎ প্রকাশ করে; প্রার্থনা সেই প্রকার ঈশ্বর চরণের সুশীতল বায়ু পাইয়া জমিয়া যায়, উহা পৃথিবীর পাপী নরনারীর শুষ্ক প্রাণে ভক্তিবারি ও অনুতাপের অশ্রু দিয়া সুফল ফলায়, বিপথগামী হইলে আলো দেয়, মোহ নিদ্রা হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জাগাইয়া দেয়।

৩। প্রকৃতি ও স্বভাবের গতি স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে। সহজ জ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই যে এ পৃথিবী শিক্ষাস্থল। আমরা প্রথমে নিজের দেহ হইতে মনের কার্য্য শিক্ষা করিতে পারি। এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে আমরা ছাত্র ও ছাত্রীরূপে

শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। মনোরাজ্যে এই নয়নের সঙ্গে আলোর যোগ যে প্রকার সেই প্রকারই ধর্ম্মরাজ্যে দেখা যায়। বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের কাছে এমন সুন্দর ধর্ম্মরাজ্য যে আত্মার প্রাণস্বরূপ, অনন্ত কালের যে দ্রব্য তাহাও আমরা দেখিতে পাই না। যে কোন ধর্ম্মের লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে চলে না, বিপদ পরীক্ষায় আমরা কিছুতেই ঠেকিতে পারি না। মনরূপ পথিক অন্ধকার রাত্রে আলো বিহীন হইয়া গম্য স্থানে কিছুতেই যাইতে পারে না।

৪। ভক্ত যেন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের ন্যায়, কারণ শিশু যেমন ভালমন্দ জানে না, দস্যু ডাকাতের কোলে যার তার কোলে মস্তক রক্ষা করে; ভক্ত শিশুও এই প্রকার অবিশ্বাসী নাস্তিকের হস্তে বিশ্বাস করিয়া আপনাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন।

৫। যখন ভক্তেরা এ পৃথিবীতে আসেন তখন যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তারাও ধন্য হয়। ইহার অর্থ কি? পাপী নাস্তিক পাষণ্ডেরা ধন্য ইহার অর্থ কি? এই কি নয় যেমন সরোবরের মধ্যস্থানে ইষ্টকখণ্ড ফেলিলে প্রথমে সেই স্থানের জল কম্পিত হইয়া সমস্ত সরোবরে পরিব্যাপ্ত হইয়া শেষ সীমা পর্য্যন্ত যায়, সেই প্রকার প্রেরিত মহাপুরুষেরা পৃথিবীরূপ সরোবরে ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পান, প্রথমে নিকটের লোকের পরিত্রাণ, ক্রমে পাপী-তাপী নাস্তিকের সকলেরই পরিত্রাণ হয়।

৬। যখন পাপের অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন থাকে সেই সময় মহাপুরুষের জন্ম হয়। এক একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন আর

চতুৰ্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশ উদ্ধার করিতে তাঁরা আসেন, আবার তাঁরা পাপীকে জীবন মুক্ত করিয়া চলিয়া যান। যদি না মহাপুরুষকে ভগবান পাঠাইতেন ঘোর অধর্ম্ম অত্যাচারে পৃথিবী ধ্বংশ হয়ে যাইত। মোহাচ্ছন্নে আমরা মগ্ন থাকিতাম। এই ভয়ানক দুঃখ যন্ত্রণা অবিশ্বাস অশান্তিপূর্ণ স্থান কি ভয়ানকই হইত। সেই জন্য দয়াময় পিতা ঘোর নারকী পাপীদিগের উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য যুগে যুগে ভক্ত সাধু মহাত্মাদের পাঠান।

উপহার।

[শ্রীকেশব-অনুজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন লিখিত]

যত দিন আছে ক্ষিতি, চন্দ্র তাহে রয়,
উদ্যান গোলাপ বিনা, নীরস যে হয়।
গঙ্গা ছাড়া এ ভারত, নাহি ভাবা যায়,
কোকিল না ঝঙ্কারিলে, সঙ্গীত কোথায়?
পুত্র ছাড়া মাকে কভু, ভাবিতে কে পারে?
পতি-পত্নী দুই জন, ভাবি একবারে।
বসন্তে মলয় বহে, জে'ন ইহা স্থির,
তোমা ছাড়া কে ভাবিবে, "কমলকুটীর"?

এইরূপে বস্তু যত, বদ্ধ হয়ে আছে কত,
নিগূঢ় যোগেতে তারা করে আকর্ষণ।
একটিকে ভাবি যাই, অন্যটি তখনি পাই,
ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত তাদের জীবন॥
ধরি অন্তরে কামনা, সদা নিত্য এ প্রার্থনা,
তুমি থে'ক নিত্য যোগে আমাদের সনে।
যত দিন আছে ধরা, আশা পুণ্যে হয়ে ভরা,
এ বাড়ীর সঙ্গে তুমি পড়িবে যে মনে॥
"কমলকুটীর" নাম, হয় যেন সুখধাম,
তুমি তাহে শশীসম করিবে বিরাজ।
কমলে গোলাপ ফুটি, চারিদিকে গন্ধ ছুটি,
আমোদিবে প্রিয়জনে ধরি দিব্য সাজ॥

ব্রহ্মবাদিনী চরিত।

[শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা লিখিত "নববিধান" হইতে।]

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ধন্য দেব! মহিমা তোমার, বুঝে সাধ্য কার।
পলকে প্রলয়, হয় শশ্মান সম সংসার।
প্রকাশি জননী স্নেহ, রচিলে মানব দেহ,
করিলে তাহে প্রাণ সঞ্চার
সাজাইলে নানা সাজে অপরূপ চমৎকার।
শেষে চিতানল জ্বেলে, নিজে তারে দিলে ফেলে,
পঞ্চে পঞ্চ মিশালে আবার;
আপন স্বরূপে জীবে করিলে হে প্রত্যাহার।
চিরদিন এই খেলা, ভাঙ্গ গড় দুটী বেলা,
নাহি মায়া মমতা বিকার;
(তোমার) অবোধ সন্তান মোরা করি তাই হাহাকার।
দেখে শুনে ভয়ে মরি, ওহে লীলাময় হরি,
দশদিকে হেরি নৈরাকার;
শোক দুঃখ সব মিছে, তুমি সত্য, তুমি সার।

আচার্য্য শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি জগন্মোহিনী দেবী ·· ··· ············· স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে গত চতুর্দ্দশ

বর্ষ কাল ইনি বৈধব্য এবং উৎকট রোগ যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। পিতার অবর্ত্তমানে সন্তানবৃন্দ মাতাকেই আশ্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেন। হঠাৎ পৃষ্ঠাঘাত রোগে সেই মাতা পরলোক গত হওয়াতে তাঁহারা শোকে নিতান্ত ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে সমস্ত পরিবারটী যেন বন্ধন বিহীন হইয়া গিয়াছে। পিতৃবিয়োগ কালে এই সকল পুত্র কন্যাগণ অনেকেই অল্পবয়স্ক ছিলেন, এজন্য পিতৃশোক তাদৃশ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। মাতার মুখ চাহিয়া তাঁহার স্নেহকোলে তাঁহারা এ যাবৎকাল শান্তি ও সান্তনা সম্ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই মাতৃদেবীকে হারাইয়া সকলে গভীর শোক সিন্ধুতে ভাসিতেছেন। যিনি মাতার মাতা পরম মাতা তিনিই ইঁহাদের শোক দুঃখ মোচন করুন।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী সদ্বংশজাতা সৎকুলদ্ভবা এবং সুলক্ষণা-ক্রান্তা কন্যা ছিলেন। যখন নবম বর্ষীয়া বালিকা তৎকালে স্বর্গগত হরিমোহন সেন ইঁহাকে কেশবের সহধর্ম্মিণীরূপে মনোনীত করেন। সেই হইতে শ্বশুর গৃহে প্রথমে ভক্তমাতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্নেহ ও যত্নে এবং তদীয় ধর্ম্মজীবনের শীতল ছায়ায় প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হন। পরে বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে ছায়ার ন্যায় ভক্তবীর স্বামী দেবতার পথ অনুসরণ করেন। আচার্য্য পত্নী যদিও আধুনিক শিক্ষা প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয়ে কিম্বা গৃহে রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রতিভাবলে এবং ধর্ম্মানুরাগ প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সমধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। পদ্য এবং গদ্য

উভয়েতেই তিনি বেশ রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত দুই একখানি পদ্য এবং সঙ্গীত পুস্তক আছে। তদ্ব্যতীত সাময়িক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। গদ্য অপেক্ষা পদ্যে তাঁহার অধিক উৎসাহ, অনুরাগ দেখা যাইত।

তাহাতে অনুপ্রাশ শব্দ বড় ভাল বাসিতেন। কেশব চন্দ্রের সহচর অনুচর প্রচারক বৃন্দের চরিত্রানুসারে প্রতিজনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা দ্বারা দুইবার নাম করণ করেন। প্রতিবাসী মহিলা ও বালক বালিকা এবং আপনার পুত্র কন্যা ও আত্মীয় সকলকেই ঐরূপে এক একটী নাম দিয়াছিলেন। এ প্রকার পদ্য রচনা তাঁহার জীবনের এক প্রধান সুখকর এবং আমোদজনক অবলম্বন ছিল। এই সকল নাম এমন ভাবে দিয়াছিলেন যে তাহাতে প্রতিজনের চরিত্র লক্ষণ বর্ণিত আছে। নিন্দার ছলে নহে, অথচ যাহার যে দুর্ব্বলতা এবং মহত্ত্ব তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট এবং আমোদিত হইয়াছিলেন। তদীয় কবিত্বময় জীবনে সকল সময়ে, সমস্ত বিষয়ে কবিত্বের ভাব দৃষ্টিগোচর হইত। নির্জ্জীব নিরুদ্যম স্ফুর্ত্তি বিহীন সে জীবন নহে।

এই সুলক্ষণাক্রান্তা নারী-প্রকৃতির ভিতর সাধারণ নারী-জীবন অধ্যয়ন করিয়া কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছেন। নারী জাতির ধর্ম্ম, নীতি জ্ঞান, সামাজিক আচার ব্যবহার, সাধন ভজন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাদের অনতিক্রমনীয় স্বাভাবিক বিশেষত্ব কি, এ সমস্ত জানিবার পক্ষে আপনার ধর্ম্ম পত্নীই তাঁহার বিশেষ সহায় এবং উপলক্ষ ছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হিন্দু

পরিবারস্থ গুরুজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া, সমবয়স্ক রক্ষণশীলা ভীরু-স্বভাবা সঙ্গিনীদিগের সহিত বাস করিয়াও জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক স্বামীর সঙ্গে অভিভাবকগণের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ঘরের বাহির হওত ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে পারে তাহা আমরা এস্থলে প্রথম দেখিয়াছি।

স্ত্রী যদিও হিন্দুর অন্তঃপুরবদ্ধা লজ্জাবতী রক্ষণশীলা, তথাপি পতিই যে সতীর একমাত্র পরমগতি, শ্রীমতি জগন্মোহিনী সে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন বৃক্ষের ইনি একটী সুন্দর সুরসাল ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ধর্ম্মাত্মা নারী অন্ধের ন্যায় স্বামীর পথ কদাপি অনুসরণ করেন নাই। হঠাৎ না বুঝিয়া স্বামীর সব কাজে তিনি যোগ দিতেন না, বরং অনেক সময় বাধা দিতেন, তর্ক এবং প্রতিবাদ করিতেন। পারিবারিক ধর্ম্মসংস্কার এবং সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া অতিশয় ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত এ জন্য কেশবকে স্ত্রীর সহিত মহা সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে ভক্তেরই জয় হইয়াছে, কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে অন্যতর একটী শিক্ষারও স্থল ছিল।

সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের জন্য তাঁহাকে কত সময় কত বিপদে পড়িতে হইয়াছে। স্ত্রী স্বামীর সে সমস্ত বিপদের সমভাগিনী ছিলেন। কখন কখন উভয়ের মধ্যে মতামতের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইত। "স্ত্রী অবলা" একথা শুনিলে, কেশব বলিতেন, "অবলা কৈ? বিলক্ষণ "বলা" বলিয়াই তো বোধ হয় হয়!"

অন্যেরা বলে স্ত্রী অবলা, কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিতেন "সবলা।" স্ত্রীজাতির কত যে বল তাহা তিনি আপন সহধর্ম্মিণীতে ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সে বলের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই মহাশক্তি মহাদেবীর মহাবল দৈববল দেখিতেন সন্দেহ নাই।

নিজের স্ত্রীর চরিত্রগঠন এবং সংস্কার করা আর এ দেশের হিন্দু পরিবারস্থা মহিলাকুলের সংস্কার করা কেশবচন্দ্রের চক্ষে দুই সমান মনে করিতে হইবে। কেন না, তাঁহার স্ত্রী স্বভাবতঃ হিন্দু স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিস্বরূপা ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিতা বিলাতি অনুকরণাভিলাষিণী সভ্যা নব্যাদিগের তিনি প্রতিনিধি নহেন, হিন্দু পরিবারজাত অকৃত্রিম অবিমিশ্র দেশীয় মহিলাকুলের প্রতিনিধি। কেশবচন্দ্র এইরূপ দেশীয় ভাবাপন্ন ভারতমহিলাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী আর্য্যনারীরূপে গঠন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন এবং .... তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেশীয় আদর্শে গঠিত কন্যাগণও তৎপথানুবর্ত্তিনী। বৈদেশিক প্রণালীতে শিক্ষিতা নব্যা মহিলাদিগের রুচির সহিত যদিও ঈদৃশ প্রাচীন প্রথার স্বদেশীয় শিক্ষা এবং ধর্ম্মজীবনের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু এক্ষণে অনেকের পক্ষে উহা আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে।

মনে কর, একটী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া অন্তঃপুর নিবদ্ধা হিন্দুকুলবধূ। তিনি কলুটোলার সম্ভ্রান্ত বৃহৎ সেন পরিবারের বধূ ও দুহিতাদলের অন্তর্গত। শিক্ষা সংস্কার রুচি সকলেরই পুরাতন প্রথার অনুরূপ একই অবস্থাপন্ন। নাটক, রামায়ণ, মহাভারত

তাঁহাদের পাঠ্য; তাস, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী তাঁহাদের খেলা। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবে যাত্রার গীত শুনিয়া এবং তাহার দুই একটী শিখিয়া নিভৃতে বসিয়া মৃদুস্বরে তাহা গান করা, গৃহের অনুষ্ঠিত পূজাপার্ব্বণ এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া;—যাবতীয় অল্পবয়স্কা পুরবাসিনীগণ এইরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেন। দেবী জগন্মোহিনী তন্মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তি। একদিকে এই, আর অপরদিকে একবিংশতি বর্ষীয় যুবক স্বামী কখন মিস পিগটের গৃহে ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপনান্তর স্বীয় বনিতাকে গোপনে তথায় লইয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। কখন বা শঙ্কর এবং বিধবাবিবাহ দিবার জন্য নিজ ব্যয়ে বাজার হইতে বস্ত্রালঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া আনিতেছেন। কখন কোন দুঃখিনী নিরাশ্রয়া বিধবাকে স্বগৃহে স্থান দিতেছেন। স্ত্রী এই সকল অভাবনীয় অভিনব কার্য্যের আয়োজন উদ্যোগ দেখিতেন আর আশ্চর্য্য হইয়া বালিকা-সুলভ আমোদ কৌতুকে মাতিয়া সঙ্গিনী-গণের সহিত হাসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইটী প্রথম শঙ্কর বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান। কিন্তু এ সকল অভিনব সংস্করণ কার্য্যে তিনি প্রথম যোগ দিতেন না। অধিকন্তু স্বামীর কার্য্যে অনেক সময় বাধাও দিতেন।

ইহাতে যুবক ব্রাহ্মদল কেশবচন্দ্রকে অনুযোগ করিতে ছাড়েন নাই। এইরূপ পারিবারিক সংগ্রামের অবস্থায় আচার্য্য এদেশের ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম কিরূপ হইবে, স্ত্রীজাতি তাহার সহিত কিভাবে মিশিবে, তাদের জাতীয় পুরাতন সদ্‌গুণ সদাচারগুলি বজায় রাখিয়া

কিরূপে তাহাদিগকে সংস্কৃত করিতে হইবে ইহাই তখন চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতেন। নিজের স্ত্রীচরিত এ বিষয়ে তাঁহার প্রথম পাঠ্য।

কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত নূতনবিধ সংস্করণ প্রথার প্রতিবাদ করিয়াও শ্রীমতী জগন্মোহিনী স্বামীর সঙ্গে উপাসনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে কখন ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে অপরাপর আত্মীয়া পুরনারীরাও উপাসনা শুনিতে আসিতেন। তদ্ব্যতীত স্বামী যখন ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত হইয়া গৃহবহিস্কৃত হন, তখন তিনিও আত্মীয় গুরুজনের তাড়না গঞ্জনা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন।

সে সময় ঠাকুর পরিবারের ভিতরে গিয়া বাস করা, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া রক্ষণশীল জাত্যভিমানী হিন্দুদিগের চক্ষে অতিশয় উৎকট পাপ বলিয়া মনে হইলেও, তিনি স্বামীর অনুরোধে একাদিক্রমে ছয়মাস কাল অবস্থিতি করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবপত্নীকে "মা লক্ষী" বলিয়া প্রেমিক পিতার ন্যায় সম্বোধন করিতেন। তদীয় পুত্র কন্যা এবং পুত্রবধূগণের সহিত তিনি যেরূপ সুখে কালহরণ করিতেন, তদ্‌বৃত্তান্ত অতীব মনোহর। ঠিক বাড়ীর একটী কন্যার মত তাঁহাকে তথায় অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছিল। পরে যখন আচার্য্য পীড়িত হইয়া স্বীয় বাস ভবনের নিকট একটী সামান্য ভাড়াটিয়া বাটীতে সমাজচ্যুতের ন্যায় সকলের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, একাকী থাকিতেন, স্ত্রী তখনও সেই দুঃখ অপমানের সমভাগিনী ছিলেন। তদনন্তর কয়েক বৎসর পরে

নিজগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল স্বামীর ধর্ম্মের অনুরোধে আশ্রম বাটীতে বাস করেন। এইরূপ অনেকানেক পরীক্ষার সময় এবং ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আচার্য্য গৃহিণী আপনাকে অসুবিধা এবং কষ্টের অবস্থায় ফেলিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সন্তানগণ সহ অতিকষ্টে তিনি স্বামীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বার বার ভ্রমণ করিয়াছিলেন! শিবপুরে একটী সামান্য বাটীতে, সাধন কাননে খড়ের চালা ঘরে কাল কাটাইয়াছেন। আচার্য্য যৎকালে বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পত্নী মস্তকের কেশ কর্ত্তন এবং বৈরাগ্য গৈরিক ধারণপূর্ব্বক তৎপথের অনুবর্ত্তিনী হন। স্বামীদেব যেরূপ ব্রাহ্ম সাধকদিগকে লইয়া উপাসনা সাধন ভজন করিতেন, তিনিও তেমনি প্রতিবাসিনী এবং আত্মীয় মহিলাগণের সহিত নিয়মিত সাধন ভজন রাত্রিজাগরণ এবং কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বাহ্যিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি পূর্ব্বাপর ঠিক হিন্দু স্ত্রীর মত চিরদিনই একইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সদাচার-নিষ্ঠ শুদ্ধাচারিতা যথেষ্ট ছিল, একটু সামান্য অনাচারও সহ্য করিতে পারিতেন না।

দেবী জগন্মোহিনীর ধর্ম্মভাব ভক্তি-প্রধান ছিল। কিন্তু কোনরূপ অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার পৌত্তলিকতাকে তিনি প্রশয় দিতেন না এবং কঠোর শুষ্কজ্ঞানের ধর্ম্মেতেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ভাবগ্রাহী আত্মা চিরদিন এক অদ্বিতীয় নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরম দেবতাকে প্রেম ভক্তি উপহারে পূজা করিয়া আনন্দে বিগলিত হইত। অতি সহজ সুমিষ্ট অথচ জ্ঞান

সঙ্কত বাক্যে তিনি ব্রহ্মের আরাধনা করিতেন। তদ্দ্বারা বুঝা যাইত, তাঁহার সারগ্রাহী আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ সকলের মর্ম্ম গ্রহণে বিলক্ষণ উপযুক্ত ছিল। প্রার্থনাও তাহার অনুরূপ। অন্যের উপাসনায় যোগদিয়া হৃদয়ে তৃপ্তিবোধ না হইলে নিজে আবার এক তন্ত্রী সহকারে সঙ্গীত করিয়া, তিনি প্রাণের পিপাসা দূর করিতেন। কণ্ঠেরস্বর অতিমৃদু মধুর এবং সুশ্রাব্য ছিল। গীত রচনা করিয়া তাহাতে নূতন বিধ মিষ্ট সুর সংযোগ করিতে পারিতেন। একঘেয়ে রকম উপাসনা, একঘেয়ে রকম গান তাঁহার কিছুতেই তৃপ্তকর হইত না। কবিত্বরস পূর্ণ নূতন বিধ সুরের ভক্তি ভাবের সঙ্গীত শুনিলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মৃদঙ্গ করতালের সহিত মত্ততার সংকীর্ত্তন তাঁহার বড় প্রিয় ছিল, তাহাতে হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত হইত। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় নারীহৃদয় কেমন তৃপ্তি শান্তি লাভ করিতে পারে এই ব্রহ্মবাদিনী মহিলার জীবন তাহার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ভাবের স্রোতে ভাসিয়া জাতীয় স্বভাবের স্বাধীন উন্নতির পথে ধর্ম্ম জীবন বিকশিত হইবার পক্ষে যাহাতে কোন বাধা না পায় তজ্জন্য আচার্য্য কেশব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। পুরুষোচিত জ্ঞান কিম্বা কঠোর ধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে তিনি শিক্ষা দিতেন না, সে নিয়মে কাহাকে বাধ্যও করিতেন না। তাঁহার ঈদৃশ সহায়তায় তদীয় সহধর্ম্মিণী মুক্তভাবে স্বভাবের সরল পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ইদানীন্তন কয়েক বৎসর সব মিলিয়া উৎসবের সময় যাহাতে একত্রে সকলে মহানগর সঙ্কীর্ত্তন করেন তদ্বিষয়ে বারম্বার উৎসাহ

প্রকাশ করিতেন। দুই একবার বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। নির্জ্জন কাননে, উপবনে, পর্ব্বতে, নদীতটে বসিয়া উপাসনাদি সাধনে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মধ্যে মধ্যে বিশেষ ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। একদিকে ইঁহার হৃদয় ভক্তিভাব পূর্ণ অতি কোমল ছিল, অপর দিকে ধর্ম্মবলের দৃঢ়তা এবং বীরত্বও দেখা গিয়াছে। যার তার কথায় মতের এবং কথার পরিবর্ত্তন করিতেন না।

সামাজিক ভাবে বড় ছোট শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্য অসভ্য সকল প্রকার নরনারীর সহিত মিশিতেন, বিবিধ বিষয়ে তাহাদের সহিত প্রসঙ্গ করিতেন, আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন, কিন্তু আপনার ধর্ম্ম মর্য্যাদার গণ্ডীর বাহিরে যাইতেন না। একদিকে সুসভ্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ, অপরদিকে প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তিনী অশিক্ষিত গ্রাম্যনারী এমন কি হৈমী ঝি পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মুক্তভাবে মিশিয়া কথাবার্ত্তায় আনন্দ এবং আমোদ উপভোগ করিয়াছে। বিষণ্ণ ভাবে জীবন-হীন জড়ের ন্যায় তাঁহাকে কেহ কদাপি একাকী বসিয়া থাকিতে দেখে নাই। অতি বালিকা অবস্থা হইতে তাঁহাতে সজীবতা এবং বুদ্ধি প্রতিভার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই বিশেষ লক্ষণ থাকাতে পিতৃ গৃহে, মাতুলালয়ে, সশ্রু ভবনে তিনি সকলেরই বিশেষ আদর ভাজন ছিলেন।

অনেক স্ত্রীলোক আছে যাহারা জীবনেও মৃতের মত থাকে, অস্তিত্ব আছে কি নাই বুঝা যায় না; মরিয়া গেলেও

অবর্ত্তমানতা কেহ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আমরা আজ যাঁহার কথা লিখিতেছি তিনি পরলোকগতা হইলেও স্বীয় জীবন প্রতিভার জীবন্ত ছবি হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কমলকুটীরের গৃহলক্ষ্মী ভক্তপত্নী এখানে নাই এ কথা এখনো কাহারো মনে হয় না। বস্তুতঃ জীবন্ত যে, সে কখন মরে না।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী অতিশয় সন্তান-বৎসলা ছিলেন। পাঁচটী পুত্র পাঁচটী কন্যাকে বিপুল ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত প্রতিপালন করিয়া দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনে তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দয়া মায়া তাঁহার যথেষ্ট ছিল। খাদ্য সামগ্রী, অর্থ বস্ত্রাদি কুটম্বিনী এবং দয়ার পাত্র পাত্রীদিগকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেন। মাতৃগত প্রাণ সন্তানবৃন্দ শেষদিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক ভক্তির সহিত এই জননী দেবীর সেবায় স্বীয় স্বীয় জীবনকে কৃতার্থ করিয়াছেন। পাছে কেহ দুঃখ শোকে অধীর হয় এই ভয়ে মাতা পুত্র কন্যা কাহাকেও মুমূর্ষু অবস্থায় বিদায় সূচক কোন ভাব জানিতে দেন নাই। কেবল নীরবে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। ডাক্তার বন্ধু প্রাণধন বলেন, এবার তাঁহার মুখে কোন কথা প্রায় শুনি নাই। পৃষ্ঠব্রণ দেখিয়াই আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিবসে জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে দেখিয়া একটু চক্ষের জল ফেলিয়া দুই একটী কথা বলেন এবং আশীর্ব্বাদ করেন।

আচার্য্য পত্নী ইদানী বৎসরাবধি কেবল পরলোক এবং মৃত্যু বিষয়ে কথাবার্ত্তা অধিক কহিতেন এবং বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, এবার উৎসব পর্য্যন্ত বোধ হয় আমি থাকিব না।

সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন, কমলকুটীরে আর্য্য নারীদিগকে লইয়া উৎসব করিলেন, ৩।৪ দিন রাত্রি জাগিয়া নববৃন্দাবন নাটক দেখিলেন, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত দৌহিত্র যুবরাজ শ্রীমান রাজরাজেন্দ্রের সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন, সমস্ত শেষ করিয়া পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, সচ্চিদানন্দ হরির নাম শুনিতে শুনিতে অমৃত ধামে মধুপুরে স্বীয় স্বামীদেবতার সন্নিধানে চলিয়া গেলেন।

এই দেখিলাম, শুভ্র সুন্দর প্রসন্ন স্বামীর পূজা বেদীর তলে যোগাসনে উপবিষ্টা হইয়া একতন্ত্রী যোগে হরি গুণ গান করিতেছেন, অশ্রু বিগলিত নেত্রে প্রার্থনা করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাহা এক মুষ্টি চিতাভস্মরূপে গৈরিক বসনাবৃত একটী ক্ষুদ্র ধাতব পাত্রের অন্তর্গত হইয়া বেদীর নিম্ন সোপানে স্থাপিত রহিয়াছে।

কালের প্রচণ্ড প্রভাব দর্শনে তাই সঙ্গীত ধ্বনি উঠিল ; —"ধন্যদেব ! মহিমা তোমার। বুঝে সাধ্যকার। পলকে প্রলয় হয়, শ্মশান সম সংসার।"

মাতৃভক্তি সঙ্গীত।

সিন্ধু।—একতালা।

শিখাও মাতৃভক্তি মোরে, ওমা বিশ্ব প্রসবিনী
তব প্রতিনিধি আমার মা জগত মোহিনী।
ভাবিলে যাঁর প্রেম মুখ, দূরে যায় শোক দুঃখ,
আদরে হৃদয়ে তাঁরে, রাখিব দিন যামিনী।
(মা মা বলে তাঁরে ডাকিব দিন যামিনী।)
যাঁর স্নেহ ছায়াতলে, নিরাপদে ধরাতলে, ছিলাম সকলে
সুখে, হায় এবে কোথা তিনি ;
তোমার অমর ধামে, ভকত পিতার বামে,
আছেন আমার মাতা, যুগল ব্রত ধারিণী।
অনন্ত প্রেম মিলনে, পিতা মাতা দুইজনে,
গাইছেন আনন্দ মনে, তোমার গুণ কাহিনী।*

---

* শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা সম্পাদিত "নববিধান ৫ম ভাগ, তৃতীয় খণ্ড "ব্রহ্ম-বাদিনী চরিত" হইতে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণে ইংলণ্ডস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রদত্ত সহানুভূতি-লিপি।

[ইহা কমলকুটীরে প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত আছে।]

EXPRESSION OF SYMPATHY
TO
THE WIDOW AND FAMILY OF
Keshub Chunder Sen

MRS. SEN,

Remembering the disinterested and noble efforts of your husband to elevate and bless the people of India we join together at this sad moment of your bereavement in an expression of sympathy to you and your family on the great loss you are called to bear; and we pray that He who has promised to be a Father to the Fatherless, and a Husband to the widow may comfort and sustain you all now and for evermore.

I. Adair. I M. Channing I E. De Laporte and others.

শুভ জন্মদিনে।

বিভাস—একতালা।

আজি সুপ্রভাতে জন্মিলেন জগতে
ব্রহ্মানন্দ-সতী জগন্মোহিনী।
যাঁহার জনমে হেরি ধরাধামে
নারী মূর্ত্তিমতী "ব্রহ্মনন্দিনী"।

(যিনি) নামে, রূপে, গুণে গোলাপ-সুন্দরী,
প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠা-সতীত্ব-মাধুরী,
একাধারে এমন নাহি কোথা হেরি,
(তাই) দিলেন নাম ঋষি "ব্রহ্মনন্দিনী"।

স্বামী-সহবাসে বনবাসে, বাসে,
সদা ফুল্লানন হাসে, ভালবাসে,
ধরায় স্বর্গ জীবে দেখাবার আসে,
(এ যে) ব্রহ্মানন্দ বামে ব্রহ্মনন্দিনী।

(এই) "দুজনে একজন" করিয়া গ্রহণ,
পাই নব বিধানে নূতন জীবন,
(হোক্) দুঃখের সংসার ব্রহ্মানন্দাশ্রম,
(গাই) জয় ব্রহ্মানন্দ-ব্রহ্মনন্দিনী।